ইসলামে
শ্রমিকের
অধিকার

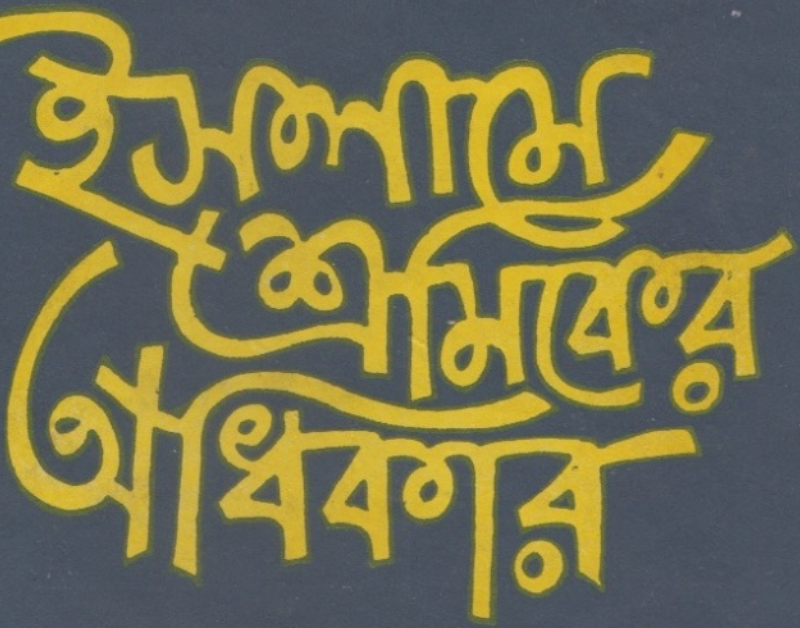

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

ই. ফা. বা. প্রকাশনা ৬২৬/২
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭২

প্রকাশক ঃ

অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২

প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল ১৯৭০
পঞ্চম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
আশ্বিন ১৩৯৩ ; মুহররম ১৪০৭

মুদ্রক ঃ
মোস্তাফা শহীদুল হক
মোস্তাফা প্রিন্টার্স
১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা-১

বাঁধাইকার ঃ
আল-ইসলাম বুক বাইণ্ডার্স
৬৩, শুকলাল দাস লেন

মূল্য ঃ ২৪.০০ টাকা মাত্র

ISLAMEY SHRAMIKER ADHIKAR (Workers' Rights in Islam) ঃ Written by Farid Uddin Masoud in Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh. September 1986

Price ঃ Tk. 24.00 only. Dollar (U. S.) ঃ 1.50

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পুঁজিবাদী সাদা সাম্রাজ্যবাদীদের

হাতে

শোষিত ও লাঞ্ছিত

সমাজতন্ত্রী লাল সাম্রাজ্যবাদীদের

হাতে

প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত

সর্বহারা মেহনতীদের উদ্দেশে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

ইসলাম যেদিন প্রথম প্রচারিত হয়, সেদিন নিপীড়িত ও মজদুর সমাজই তাকে স্বাগত জানিয়েছিল সর্বপ্রথম। কিন্তু ভাগ্যের চরম পরিহাস, আজ শ্রমিক ও মজলুম সমাজই ইসলাম সম্পর্কে সবচাইতে অধিক উদাসীন বা শত্রুভাবাপন্ন। ইসলামের আদিম রূপের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ই যে এজন্যে প্রধানত দায়ী, তা বলাই বাহুল্য। ইসলামের আদিম বিপ্লবী রূপের সঙ্গে আমাদের পুনরায় পরিচয় এ অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান ঘটাবে এক লহমার মধ্যে। এজন্যে ইসলামে শ্রমিক মজদুর নিপীড়িত মানবতার মুক্তির যে পথনির্দেশ রয়েছে, তা তুলে ধরা একান্ত অপরিহার্য। বলা বাহুল্য, একাজটি যথেষ্ট দুরূহ।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাফল্যের সাথে এই দুরূহ কর্মটিই সমাধা করেছেন। তিনি বিভিন্ন আধুনিক মতাদর্শের তুলনায় শ্রমিকের অধিকার দানের ব্যাপারে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ করেছেন—শুধু তত্ত্বের আলোকে নয়, ইতিহাসের বাস্তব নিরিখেও। এ ধরনের একখানি মূল্যবান গবেষণাধর্মী গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দেবার জন্যে আমরা লেখককে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ বইখানি যে পাঠক সমাজে অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, মাত্র ৫/৬ বৎসরে তার চার চারটি সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়াই তার বড় প্রমাণ। পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে আমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে জানাই অযুত শোকরিয়া।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। ২১. ৯. ৮৬

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। ধারাবাহিক শ্রমিক আন্দোলনের ফলে পূর্বের তুলনায় এদের অবস্থা কিছুটা উন্নততর হলেও এখনও মানবেতর অবস্থায়ই তাদের দিন গুজরান হচ্ছে। নানা নিপীড়নের যাঁতাকলে আজো পিষ্ট হচ্ছে তারা। কোথাও শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীদের হাতে আর কোথাও লাল সাম্রাজ্যবাদী সমাজতন্ত্রীদের হাতে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে শ্রমজীবীদের সকল সমস্যারই সার্বিক ও ন্যায়ানুগ সমাধানের দিকনির্দেশ করেছে। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে ইসলামী বিধি-বিধানসমূহ তুলে ধরার জন্যেই ছিল আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বইটি রচিত ও প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল সত্তর সালে। কয়েক মাসের মধ্যেই এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নিজের নানা ঝামেলার দরুন দ্বিতীয়বার আর এর দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নি। এ বৎসর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-এর সৌজন্যে বইটি পুনর্বার প্রকাশের সুযোগ হল। বিশিষ্ট নজরুল বিশেষজ্ঞ সুসাহিত্যিক সাংবাদিক জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ বইটির আমূল সম্পাদনা করে দিয়েছেন। এর পেছনে ঢাকা কেন্দ্রের আবাসিক পরিচালক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর, বন্ধুবর অধ্যাপক এ. এস. এম. ওমর আলী ও জনাব মুনসুর-উদ-দৌলাহ্ পাহলেয়ানকে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে খাট করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

সুখের কথা, ইতিমধ্যে করাচী থেকে বইটির উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আরবী সংস্করণও প্রস্তুতির মুখে ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব যেমনভাবে মানুষের জীবনে অভূতপূর্ব প্রগতির জোয়ার নিয়ে আসে, তা তেমনি মানুষের অনাবিল ও জটিলতাহীন জীবনে অনেকগুলি জটিল সমস্যারও সৃষ্টি করে। এই সমস্যা হলো শ্রমিক-সমস্যা—যা বর্তমান পৃথিবীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনার প্রতিটি অণুপরমাণুকে তীব্রভাবে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। শ্রমিকরা আজ হাজারো শোষণের নিগড়ে পিষ্ট; আজকের পৃথিবী তাদের সমস্যা প্রকৃতভাবে অনুধাবন করতে এবং এর যথার্থ সমাধান দিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

আজকের শ্রমিক শ্রেণী সাদা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিদের হাতে চরমভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তারা হিংস্র লোলুপতা নিয়ে তিলে তিলে তার সমস্ত জমাট রক্তটুকু চুষে চুষে খাচ্ছে; হায়েনার জঘন্যতা নিয়ে পলে পলে তার জীবনীশক্তি ধ্বংস করে চলেছে। কিন্তু প্রতিদানে তারা তাকে কি দিয়েছে? দিয়েছে শুধু সীমাহীন অভাব ও দারিদ্র্য, অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনার আত্ম-প্রসাদ। টুকরো টুকরো করে নিজেকে বেচে দিয়েও মিলে না তার মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকু; আর পুঁজিপতি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সাত-মহলা প্রাসাদে থেকে একান্ত আয়াসে মুখে তুলে নেয় তার শোণিতাক্ত লাল রক্তটুকু।

অন্যদিকে অনাবিল শান্তিসুখের মোহময় স্বপ্ন দেখিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আবেগময় বাণী শুনিয়ে বৈষম্যহীন এক নির্মল স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্নময় আশা দিয়ে, মেহনতীদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মায়াময় আহ্বানের বেড়াজালে তাদেরকে চরমভাবে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করে চলেছে সমাজতন্ত্রী লাল সাম্রাজ্যবাদী।

জগত জুড়ে কি এমনিভাবে 'মার খাবে দুর্বল'? এর কি কোন প্রতিকার নেই, প্রতিবিধান নেই? সর্বহারাদের জীবনে এই বিড়ম্বনার কি শেষ নেই?

ইসলাম করেছে এর ন্যায়ানুগ প্রতিকার। খোদাওন্দ করীমের বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও নবী-প্রদর্শিত রাহনুমায়ির আশ্রয়ে ইসলাম চায় এমন এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার সৌহার্দ্যমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন এক বিধানের প্রচলন করতে,

www.pathagar.com

যেখানে শোষণ নেই, নিপীড়ন নেই, সর্বোপরি নেই দুর্বলকে পিষে খতম করার জঘন্য প্রবণতা। আকাশ যেখানে ভারাক্রান্ত হয় না, সর্বহারাদের কাতর আর্তনাদে, যেখানে স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দে বয়ে চলে জীবন-প্রবাহ, চোখ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক নতুন সূর্যের ইঙ্গিতে।

এ শুধু কথার প্রলেপ নয়। ইসলাম তার প্রথম যুগের ইতিহাসে কার্যকরীভাবে এ প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে।

এ' থেকেই আমরা শ্রমিক সমস্যা ও তার সমাধানের বাস্তব আলোচনা সম্বলিত এই পুস্তক প্রণয়নের প্রেরণা পেয়েছি। এ তাদের মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার কর্মসূচী! জাতি একে কার্যকরী করে তুললেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ্ পাক যদি আমার এই মেহনত কবুল করেন এবং বইটিকে নিপীড়িত জনতার মুক্তি ও হিদায়াতের ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করে নেন, তবেই নিজেকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ্ আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমে চলার তওফিক দিন। আমিন!

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পুঁজিবাদ ও আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব /১
সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক /১৬
ইসলামের দৃষ্টিতে 'শ্রম' /৩৮
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা /৪৪
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক /৬৩
শ্রমিকদের গুণাবলী /৭০
ইসলামে শ্রম বিনিয়োগের পন্থাসমূহ /৭৪
মুজারাবাত /৮০
মুজারাআত /৮৩
মুসাকাত /৮৬
কেরায়াতুল আরজ /৮৭
শিরকতে সানাএ /৮৭
শিরকতে উজুহ /৮৭
ইহ্‌ইয়া-ই-মাওয়াত /৮৮
ইজারা /৮৮
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণে সরকারী দায়িত্ব /৯১
শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে নবী করীম (স.)-এর নির্দেশাবলী /৯৩
ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের অধিকার /১০৬
শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও এর সংরক্ষণে সরকারী দায়িত্ব /১২৩
নির্ঘণ্ট/১২৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

পুঁজিবাদ ও আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে চেতনা জাগে, ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী মুসলমানদের সঙ্গে মেলা-মেশার কারণে যে আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগে তা সেখানকার সমস্ত পুরনো মূল্যবোধকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তারা অকস্মাৎ যেন এক নূতন দিগন্তের সন্ধান পায়। ধর্মীয় পোপবাদের যাঁতাকলে এতদিন তাদের যে অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসমূহ গুমরে মরছিল তা' সহসাই যেন বিকশিত হয়ে ওঠে। সমস্ত বাঁধ তাদের ভেঙ্গে যায়—নব নব আবিষ্কারে তারা মেতে ওঠে।

এরই ফলশ্রুতিতে অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সেখানে এক অভূতপূর্ব সামাজিক রূপান্তর সংঘটিত হয়। নূতন নূতন শিল্প ও কলকারখানা আবিষ্কারের ফলে শিল্প উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। গোষ্ঠী ও সংঘভিত্তিক সব রকমের শিল্পাশ্রমগুলি ক্রমে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। গৃহ ও কুটীরশিল্পগুলি মিল ও কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। আর বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি এসবের জায়গা দখল করে নিতে শুরু করে। দরিদ্র কুটীর শিল্পীদের হাতে বড় ধরনের ব্যবসা করার প্রয়োজনীয় পুঁজি না থাকায় তারা অসহায় হয়ে পড়ে। আর অন্যদিকে বড় বড় ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বুর্জোয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্ম হয়।

যন্ত্রপাতির উন্নতির ফলে প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই শিল্পপতি বুর্জোয়া গোষ্ঠীরা অধিকতর মুনাফা লাভের সুযোগ পায়। এরা বুঝতে পারে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতে পারলে লাভের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তারা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান একীকরণে এবং শিল্পে একাধিপত্য অথবা প্রায় একাধিপত্য লাভ

www.pathagar.com

করার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করে যন্ত্রপাতির অধিকতর উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। বিশিষ্ট পণ্য বা যন্ত্র উৎপাদনের বৃহৎ কারখানাগুলির জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিরাট অঙ্কের পুঁজির আবশ্যক হয়ে পড়ে। বড় বড় পুঁজিপতিদের পক্ষেই কেবল এই প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই বুর্জোয়া বণিকগোষ্ঠীদের অবাধ সুযোগ লাভের প্রশ্নে শাসকদের সঙ্গে সংঘাত বাঁধলে তারা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। গণতন্ত্র ও সর্বময় নাগরিক অধিকারের মোহময় দাবী নিয়ে ভূমিদাস ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে তাদেরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। এইভাবে তারা পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সমস্ত বড় বড় ব্যবসা করায়ত্ত ক'রে নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাও বহুলাংশে নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। আর এমনি করেই পৃথিবীতে এক শক্তিশালী পুঁজিবাদী গোষ্ঠী ও ঐ মতাদর্শানুযায়ী এক অর্থনীতির সৃষ্টি হয়।

আমেরিকা ও নূতন নূতন সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের ফলে ঐ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর সামনে এক নূতন দিগন্ত খুলে যায়। তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে নূতন নূতন উপনিবেশ ও বাজার দখলে ব্রতী হয়ে পড়ে এবং পুঁজি বিনিয়োগ করে বিরাট বিরাট কল-কারখানা স্থাপন করতে শুরু করে দেয়। আর এদিকে হস্ত ও কুটীরশিল্পগুলি ভেঙ্গে পড়ায় এর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা উপায়হীন হয়ে পড়ে। তারা জীবিকার তাগিদে কারখানাগুলিতে এসে জমায়েত হতে থাকে। কৃষিকার্যের আধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হলে চাষ-বাস অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে পড়ায় পুঁজিপতিরা দেশের সমস্ত আবাদী ও অনাবাদী ভূমি কিনে নিতে থাকে। এতে জনসাধারণের বিরাট এক অংশ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। তারাও কোন উপায় না দেখে শিল্পায়িত শহরগুলির দিকে পাড়ি জমাতে থাকে। বাষ্পীয় যানবাহনাদির সহায়তায় সমস্ত বাণিজ্য পথগুলিও পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এতে অনেক মানুষ—যারা বাণিজ্য--পণ্য বহন করে জীবিকা নির্বাহ করত—তারা বেকার হয়ে যায়। ফলে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে পুঁজিপতিদের দুয়ারে এসে তারাও ধন্না দিতে থাকে।

এই অবস্থা পুঁজিপতিদেরকে এক অফুরন্ত সুযোগ এনে দেয়। তারা সাধারণ মানুষের এই অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে যৎসামান্য মজুরির বিনিময়ে এদেরকে মজদুর হিসাবে কারখানায় ঢোকাতে থাকে। আবার এদিকে নূতন উপনিবেশ এবং বিজিত দেশগুলি হতে লোক ধরে ধরে এনে

www.pathagar.com

শ্রমের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত বেশী মুনাফা লাভের আশায় শিল্প-কারখানাগুলিতে নিয়োগ করতে থাকে।

এমনিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভিশপ্ত পরিণামের ফলে ভূমিহীন ও পুঁজিহীন এক বিরাট জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়—যারা শুধু জীবিকার কারণে শিল্পপতিদের খেয়াল-খুশীর উপর নিজেদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আধুনিক পরিভাষায় এই সর্বহারাদেরই আর এক নাম শ্রমিক। গায়ের মজ্জা-মাংস ব্যতীত এদের আর কোন পুঁজিই নেই। শ্রমই এদের অন্ন-সংস্থানের একমাত্র উপায়। তাই নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে শিল্পপতিদের মুনাফা বাড়াতে যেয়ে এই মেহনতি মজুরদের নিজেদেরকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বেচে দিতে হয়। যতক্ষণ কাজ জোটে ততক্ষণই তারা বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। আর কাজ ততক্ষণই জোটে যতক্ষণ তাদের পরিশ্রমের পুঁজি মওজুদ থাকে। পুঁজিপতিদের কাছে এদের স্থান অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতই। বাজারের চাহিদানুযায়ী যেভাবে দ্রব্যমূল্য ওঠা-নামা করে তেমনি প্রতিযোগিতার সব ঝড়-ঝাপটার, বাজারের সব রকম ওঠা-নামার তারা অধীন। পূর্বে শ্রমিকরা নিজেদের শিল্পে বেঁচে থাকার প্রেরণা পেত, এর বৈচিত্র্যে ডুবে থেকে আনন্দ খোঁজার সুযোগ পেত; কিন্তু আজ শিল্প-বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যন্ত্রের বহুল ব্যবহার ও শ্রম বিভাগের দরুন শ্রমিক তার সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। তাই কাজের সমস্ত আকর্ষণ তার কাছে লোপ পেয়ে গেছে। সে আজ যন্ত্রের লেজুড় মাত্র। একজন অর্থনীতিবিদের ভাষায়ঃ

> আজ তার কাছে চাওয়া হয় অতি সরল, একান্ত একঘেঁয়ে অতি সহজে অর্জনীয় যোগ্যতাটুকু। তাই তার সমস্ত চাহিদা শুধু একান্তই তাকে বাঁচিয়ে রাখার ও তার বংশরক্ষার জন্য অপরিহার্য অন্ন-বস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। পণ্যের দামের অনুপাতেই মজুরের শ্রমের দাম, তাই কাজের জঘন্যতা যত বাড়ে সেই অনুপাতে বাড়ে কাজের চাপ। শ্রমিক মজুরী পায় কিন্তু তাকে তা দেওয়া হয় খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়ে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশী কাজ আদায় করে নিয়ে।

মজুর তিল তিল করে গায়ের রক্ত খরচ করে যে উৎপাদন করে থাকে তার বিনিময়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে কি দেয়? দেয় শুধু সীমাহীন দারিদ্র্য ও অভাব, অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও প্রবঞ্চনার আত্মপ্রসাদ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রমের পরেও মেলে না তাদের মাথা গুজবার ঠাঁই, আর

www.pathagar.com

অন্যদিকে পুঁজিপতি সাতমহলা প্রাসাদে থেকে মুখে তুলে নেয় শ্রমিকের লাল রক্ত।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ব্যক্তি-মালিকানায় বাধাহীন্ অধিকার রয়েছে। আর শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনই নয় অধিকন্তু উৎপাদন উপাদানেও তার এই নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা-ই নিজের অধিকারে আনতে পারে, যদৃচ্ছা মুনাফা লুটতে পারে, যার উপর ইচ্ছা এর দরওয়াজা বন্ধ করে দিতে পারে, যে কোন মূল্যে তা বিক্রি করতে পারে, তার এই স্বাধীনতায় বাধা দেওয়ার অধিকার সমাজের নেই। তাই পুঁজিপতি এত আত্মসর্বস্ব হয়ে ওঠে যে টাকার জোরে নানা ফন্দী-ফিকির করে সে প্রথমে সাধারণ মানুষকে পুঁজিহীন ও নিঃস্ব করে তোলে। এরপর মজুরি নামক টক্‌টকে মাকাল ফলটি তার সামনে তুলে ধরে। শ্রমিক ততক্ষণে এমন অসহায় হয়ে পড়ে যে, সে জীবিকার তাগিদে অন্য কিছুই আর ভাবতে পারে না। যে কোন শর্তে সে মালিকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়।

এই অর্থগৃধ্নুতার কারণে শিল্পপতিরা এত জঘন্য, এত ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে যে আজ তারা শ্রমিকের অস্তিত্বটুকুও সহ্য করতে পারছে না। শ্রমিকদের অস্তিত্ব আজ তাদের কাছে এক বিরক্তিকর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের একান্ত ইচ্ছা এদেরকে খতম করে দিতে হবে। আর যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন এমন বাড়িয়ে দিতে হবে, যাতে শ্রমিকের কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। যন্ত্র ত আর মজুরির দাবী জানায় না—হরতাল করে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অকুণ্ঠ সমর্থক ইরিক্‌সিল বলেন ঃ

> কারখানায় আমাদের মানুষের আর প্রয়োজন নেই। যন্ত্র এদের থেকে ভাল কাজ দেয়। যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানবিক শ্রমের অনেকটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তার ব্যবহার হয় কম। তাই আমাদেরকে যন্ত্র নয় বরং মানুষ খতম করে দিতে হবে। আমরা ঐ সমস্ত লোকদের খতম করে দিতে চাই, যারা কারখানায় কাজ করে—অর্থাৎ শ্রমিক। অন্য যারা গ্রামে-গঞ্জে বাস করে তাদেরকে নয়। এরা ত আমাদের সাথী—আমাদের বন্ধু। কারণ তারা আমাদের পণ্য কিনে নেয়। আমাদের বড় কথা হল—পণ্য উৎপাদনে কি করে মানুষের শ্রম কম লাগানো যায়। আর পক্ষান্তরে এমন মানুষের

www.pathagar.com

সংখ্যা কি করে বাড়ানো যায়, যারা আমাদের পণ্য ক্রয় করবে। এ-ই আমাদের মূল কথা, এ-ই আমাদের প্রথম ও শেষ কথা।[১]

পুঁজিবাদ মানুষকে এত নিষ্ঠুর করে তোলে যে, হাজারো পণ্যের সম্ভার সে পাচার করে দিতে জানে কিন্তু লাখো বুভুক্ষুর হাহাকারেও তার দিল কেঁপে ওঠে না। এদের একমাত্র আশংকাই হল চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশী হলে মুনাফার অংক কমে যাবে। তাই তারা অধিক মুনাফা লাভের আশায় লাখো মানুষকে ভুখা রেখে উৎপাদন পণ্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতেও দ্বিধা করে না।

ব্রাজিলে ফলন বেশী হতে আরম্ভ করলে পুঁজিপতিরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা পরামর্শে বসে, কি করা যায়। এভাবে উদ্বৃত্ত ফসল গর্তে খুড়ে ভূমিতে পুঁতে দেওয়া হোক। কিন্তু এ সম্ভব ছিল না। কারণ এত অধিক ফসল মাটিতে দাফন করে রাখার জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন। তারা আবার চিন্তা করল এসব সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু এতেও মৎস্য সম্পদে বিরাট ক্ষতির আশংকা ছিল। শেষে তারা সমস্ত শস্য জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু এই সজীব শ্যামল শস্যক্ষেত্রে জ্বালিয়ে দেওয়া তেমন সহজ কর্ম ছিল না। পেট্রোল ধরিয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হল। এতে প্রায় দুলাখ পাউন্ড তেল ব্যয় হয়েছিল। এমনিভাবে তাদেরকে প্রত্যেক বৎসর তা করতে হচ্ছিল, যাতে মূল্য কমে না যায়—মুনাফা ঘেটে না যায়।[২]

সরবরাহ বা যোগান বেশী হয়ে যাওয়ার ভয়ে লিভারপুলের এক সমুদ্র বন্দরে এক বৎসর দশ লাখ নারাঙ্গি ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল।[৩]

এই স্বার্থপরতা শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশকর করে তোলে। তাদেরকে অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করান হয়, কিন্তু তাদের কোন নিরাপত্তা দেওয়া হয় না। শিল্পপতির আশানুরূপ মুনাফা না হলে যে কোন মুহূর্তে সে শ্রমিকদিগকে ছাটাই করে দিতে পারে।

এইভাবে শোষিত হয়ে মজুরি পাওয়ার পর নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করতে শ্রমিকদের আবার বুর্জোয়া গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য দোকান-দার, আড়তদার প্রভৃতিরই শরণাপন্ন হতে হয়। ফলে মজুরি বাবদ দেয় টাকাটা এমনি করেই পুনরায় পুঁজিপতির পকেটেই চলে যায়।

১. Money and morals
২. Inside Latin America
৩. An Introduction to Socialism—by Mukherjee

www.pathagar.com

পূর্বে বলে এসেছি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলেই শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রচুর সম্পদ উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের দারিদ্র্য ঘোচে নি। তারা এত কম মজুরী পায় যা দিয়ে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটে না। শ্রমিক যা আয় করে সবই তার ব্যয় করে দিতে হয়—কিছুই সঞ্চয় করতে পারে না। অসুস্থ বা বেকার হয়ে পড়লে তাদের আর কষ্টের শেষ থাকে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যারা খাটে তারা প্রায় কিছুই অর্জন করতে পারে না, আর যারা সবকিছুই পায় তাদেরকে বিশেষ খাটতে হয় না।

পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় শিল্পপতিকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তার বিনিয়োগকৃত অর্থ হতে সে যত বেশী সম্ভব মুনাফা হাতিয়ে নিতে পারে। এর সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে, সে-ই ব্যবসার সৃষ্টি ও সংগঠন করে পুঁজি সরবরাহ এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে। তাই মুনাফার সবটুকু তারই প্রাপ্য—মজুর বা অন্য কারও এতে কোন অধিকারই থাকতে পারে না।

এই মনোভাবের ফলে পুঁজিপতি এমন পর্যায়ে নেমে আসে যে এ ব্যাপারে সে কোন নৈতিকতা বা মানবিকতার ধার ধারে না। এ নিদর্শন আমরা ইউরোপ আমেরিকার ধনবাদী সমাজে ভূরি ভূরি পাই।

শিল্পপতিরা এতদূর লোভী ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল যে, তারা নারী এমন কি পাঁচ বৎসরের শিশুকেও যত ঘণ্টা পারত খাটিয়ে নিত। গর্ভবতী মেয়েদেরকে পর্যন্তও কাজ থেকে রেহাই দেওয়া হত না। নারী-পুরুষের তফাৎ তাদের কাছে ছিল গুরুত্বহীন—পুরুষ ও নারী সকলেই খাটবার যন্ত্র মাত্র।

শ্রমিকদের উপর মালিকদের শোষণের চরম উদাহরণ ১৮৩০ খৃস্টাব্দের লিয়নসের রেশম শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায়। দিনে আঠার ঘণ্টা কাজ করেও একজন শ্রমিক সেখানে মাত্র আঠার 'সু' লাভ করতে পারত। আমাদের মুদ্রায় এ মাত্র তের পয়সার সমান। এমনিভাবে ১৮৭১ খৃস্টাব্দের দিকে রাশিয়ায় শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চরমে উঠে। মজুরদেরকে ন্যূনপক্ষে সাড়ে বার ঘণ্টা ডিউটি দিতে হত। যুবক ও বালক শ্রমিকদের মধ্যে খাটুনির সময়ের ব্যাপারে কোন তারতম্য ছিল না। শ্রমিকদিগকে অত্যন্ত কম মজুরী দেওয়া হত। অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদেরকে থাকতে হত। ছোট একটি সংকীর্ণ কামরায় বার জনকে পর্যন্ত একই সঙ্গে

www.pathagar.com

বসবাস করতে হত। কোম্পানীর দোকান হতে দ্বিগুণ তিনগুণ চড়া মূল্য দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাধ্য করা হত।[৪]

পুঁজিপতিরা বাজার দরকে নিজেদের স্বার্থানুযায়ী রাখতে গিয়ে যেমনিভাবে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি ভাবে অল্প মজুরিতে শ্রমিক লাভের আশায় তারা দেশে সুপরিকল্পিত ভাবে বেকারত্বও সৃষ্টি করে থাকে—শ্রমিকদের নিলামে চড়ায়। মানুষকে দরিদ্র, অসহায় ও সর্বহারা করে রাখার এক জঘন্য ইচ্ছায় মেতে ওঠে--নইলে তারা আপন স্বার্থ পূরণ করতে পারে না। এ ছাড়া আর কোন পথই তারা দেখে না। ম্যানডেভিলের ভাষায়ঃ

> গরীবদের থেকে কাজ নেওয়ার একটি মাত্রই পথ, আর তাহলে এদেরকে দরিদ্র থাকতে দাও, এদেরকে পরনির্ভরশীল করে তোল। এদের প্রয়োজন খুব অল্প করেই পূরণ করা দরকার। আপন প্রয়োজন পূরণে এদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলা চরম বোকামী।[৫]

পুঁজিবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা টাউন্‌সেন্ড উক্ত ঘৃণ্য মনোভাবটি আরও সোচ্চার করতে যেয়ে বলেনঃ

> ক্ষুধার কশাঘাত এমন এক মারাত্মক অস্ত্র যা বন্য হতেও বন্য অবাধ্য পশুগুলিকে শান্ত সুবোধ বানিয়ে ফেলে। এরই সাহায্যে অবাধ্য হতে অবাধ্যতর মানুষও বাধ্য ফরমাঁবরদার হয়ে ওঠে। তাই তোমরা গরীবদের থেকে যদি কাজ নিতে চাও তবে এর একমাত্র উপায় এদেরকে 'ভুখা' রাখ। ক্ষুধাই এমন এক আবেদনময় বস্তু যা গরীব ও সর্বহারাদেরকে যে কোন রকমের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।[৬]

এই পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট বেকারত্ব যে কি মারাত্মক অসহনীয় রূপ ধারণ করে তার কিছুটা আন্দাজ আমরা নিম্নোক্ত তথ্য থেকে জানতে পারি।

১৯৫৫ সনে মার্কিন দূতাবাস হতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, চৌদ্দ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের বেকারদের সংখ্যা হচ্ছে আটাশ লাখ বত্রিশ হাজার দুশ ছয়। আমেরিকার মত শিল্পোন্নত দেশেও যদি এমন ভয়াবহ অবস্থা হয় তবে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

---

৪. ইশ্‌তেরাকিয়াৎ আওর নেজামে ইসলাম—কৃত মাজহার উদ্দীন সিদ্দিকী।

৫. Fable of the bees

৬. Dissertation on the poor laws.

www.pathagar.com

পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমিকদের কোন মানবীয় বা সামাজিক মর্যাদা নেই। শ্রমিক শুধু যন্ত্রেরই দাসে পরিণত হয় না, অধিকন্তু দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তাকে বানানো হয় খাস্ শিল্প মালিকটির দাস। যন্ত্র যেমন উৎপাদনের একটি অঙ্গ, তেল মবিল ছাড়া এর কোন চাহিদা থাকতে পারে না, তেমনি শ্রমিকদেরকেও একটি উৎপাদন যন্ত্র হিসাবেই মনে করা হয়। শিল্পপতিদের কাছে শিক্ষা-দীক্ষাহীন নিকৃষ্ট এক জীবের মতই তাদের স্থান। এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় মজুরদের কি অবস্থা এসে দাঁড়ায় তা রবার্ট ওয়েনের একটি বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি তাঁর আদর্শ নিউলানার্ক কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে অত্যন্ত ক্ষেদ ও দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—"এরা আমার গোলাম, এদের সমস্ত জীবন আমার উপর নির্ভরশীল।"[৭]

আবার অনেক সময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশের উৎপাদনে স্ফীতি দেখা দিলে মজুর ও সাধারণ মানুষের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না। ১৯২৯—১৯৩৩-এর উৎপাদনের স্ফীতির সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কয়লার স্থলে গম ভুট্টা জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। লাখ খানেক শূকর মারা পড়ে, অধিকাংশ কার্পাস তুলা ক্ষেতেই নষ্ট হয়ে যায়। ডেন্‌মার্কে হাজার খানেক গাভী মেরে ফেলা হয়। ফ্রান্স ও ইটালিতে এক হাজার টনের মত ফল বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। দশ লাখেরও বেশী আনাজভর্তি রেলের বগী, দু'লাখ আটান্ন হাজার টন চিনি, পঁচিশ হাজার টন চাল, পঁচিশ হাজার টন গোশ্‌ত এবং আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।[৮]

একদিকে যেমন এভাবে ফসল ও দ্রব্য-সামগ্রী ইচ্ছাকৃতভাবে বিনাশ করে দেওয়া হল অন্যদিকে তেমনি এ সময়ে শুধু এক বছরেই চব্বিশ লাখ লোক না খেতে পেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেল।[৯]

নীচের ঘটনাটি দ্বারা উৎপাদন স্ফীতির ফলে বৃটেনের কি অবস্থা হয়েছিল তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

কোন এক খনি-মজুরের ছেলে অত্যধিক শীত সহ্য করতে না পেরে মাকে বলছে ঃ

ঃ মা! বড্ড ঠাণ্ডা, আগুন জ্বালাচ্ছ না কেন?

৭. Socialism by Angels.
৮. মার্কসী সিয়াসী মায়িশাত্‌কৃত লিয়াওন্‌থভ।
৯. মার্কসী সিয়াসী মায়িশাত্‌—ঐ

www.pathagar.com

ঃ ঘরে কয়লা নেই। আর তোমার আব্বার কোন আয়-রোজগার নেই; তিনি বেকার। তাই কয়লা কেনার পয়সা হচ্ছে না।

ঃ কিন্তু আব্বা বেকার হলেন কেন ?

ঃ কারণ, কয়লা উৎপাদনে স্ফীতি দেখা দিয়েছে।[১০]

শীতে গা জমে যায়, জ্বালানিও প্রচুর উত্তোলিত হয়। কিন্তু এই স্ফীতির মধ্যে লাভের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মজুর ছাটাই করে দেওয়া হল। সমস্ত কষ্টের বোঝা চাপান হল শ্রমিকের কাঁধে।

এমনিভাবে বুর্জোয়া সমাজ শ্রমিকদের অবস্থা দিনে দিনে এত অসহনীয় করে তুলল যে মানবতা হাহাকার করে উঠল। শ্রমিকরা এ আর সহ্য করতে পারছিল না। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা ব্যাকুল হয়ে উঠল। প্রথম প্রথম অবশ্য পুঁজিপতিদের টাকা ও রাজনৈতিক শক্তির কারণে তারা তেমন কোন সুবিধা করতে পারে নি। কিন্তু তারা শীঘ্রই বুঝতে পারল, তাদের জনশক্তি পুঁজিপতিদের অর্থ-সম্পদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। তাই তারা নিজেদের সংগঠন সুসংহত করার দিকে মনোযোগ দিল।

পুঁজিপতিগণ মজুরদের এই সংগঠন-প্রচেষ্টাকে তেমন সুনজরে দেখে নি। শ্রমিকদেরকে সংগঠিত হতে দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শ্রমিক সংগঠনগুলিকে প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থার উপর আঘাত বলে গণ্য করে দমন করার চেষ্টা করা হয় এবং সামান্য অজুহাতে কতিপয় সংঘবিরোধী আইন পাস করিয়ে সংঘগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনমত দ্বারাও শ্রমিক সংগঠনে বাধা দেওয়া হয়। তাদের অব্যর্থ অস্ত্র ছিল ধর্মঘট; কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী বলে অভিহিত করে তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের মূলনীতি সমষ্টিগত দর কষা-কষি করাকেও সমাজবিরোধী বলে ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্রমিকরা এই অবস্থা মেনে নিতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃটেনের শ্রমিকজীবীরা সময় কমানো ও মজুরি বাড়ানোর দাবীতে হরতাল শুরু করে দেয়। ১৮১৯ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার পাঁচশত মজুরের এক সভায় গুলী চালানোর হুকুম দেয়। ১৮২২ খৃস্টাব্দের ভারি শিল্প ও খনি-শ্রমিকদের স্ট্রাইক এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল।

১০. মার্কসী সিয়াসী মাযিশাত্—কৃত লিয়াওনেথভ।

www.pathagar.com

১৮৩১ খৃস্টাব্দে লিয়ান্‌সে যে ধর্মঘট হয় তা' পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপ নেয়। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে শ্রমিক-আন্দোলন এক বিদ্রোহের রূপ নিয়ে ভেসে ওঠে। ফ্রান্সের মজুরগণ তাদের দাবী আদায় করতে গিয়ে শুধু ধর্মঘটই করে নি, এমনকি হাতিয়ারও হাতে তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মজুরদের এই সংগ্রাম বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি। কারণ পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ার ফলে শ্রমিকদের কাছে জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে তেমন কোন সঞ্চয় না থাকায়, তারা বেশীদিন ধর্মঘট চালিয়ে যেতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় তারা মীমাংসার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে মালিক ইচ্ছা করলে অনেকদিন পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখতে পারে। এতে তার লাভের ক্ষতি হয় সত্য; কিন্তু তার আর্থিক অবস্থায় কোন চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না।

পরে শ্রমিকগণ ভোটাধিকার লাভ করলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সংঘগুলিও মুক্তি লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং স্বায়ত্তশাসিত বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক-সংঘ আইনসঙ্গত বলে ঘোষিত হয়। শ্রমিক-সংঘগুলি কর্ম-প্রচেষ্টার দরুন শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের খাটুনীর সময়ও কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শ্রমিকদের সত্যিকারের মজুরি কমে গেল। দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পেল কিন্তু সে অনুপাতে মজুরি বাড়ল না। ফলে শ্রমিক-সংঘগুলি তৎপর হয়ে ওঠে এবং ঘন ঘন ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্মঘটের দরুন জাতীয় উৎপাদনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে সরকার শ্রমিক-সংঘগুলির প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েন। তাই এ অবস্থায় শ্রমিকগণ নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত রাজনৈতিক কর্মধারা গ্রহণ করে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৃটেনের শ্রমিক-সংঘগুলি 'লেবার পার্টি' গঠন করে। তারা ১৯০৫ সালে পার্লামেন্টে নিজেদের সদস্য নির্বাচন করতেও সক্ষম হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেহেতু আত্মসর্বস্ব, ব্যক্তি-স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সেখানে মানবিক গুণাবলীর একান্ত অভাব। সে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের এক লীলাক্ষেত্র। পুঁজিপতি অপেক্ষাকৃত কম মজুরি দিয়ে বেশী

www.pathagar.com

কাজ আদায় করে নিতে নিত্য সচেষ্ট থাকে। আর শ্রমিক যথাসম্ভব কম কাজ করে বেশী পারিশ্রমিক হাসিল করে নিতে প্রয়াস পায়। শিল্প মালিক শ্রমিককে নিজের প্রতিপক্ষ এবং তার বিনিয়োগকৃত অর্থের মুনাফার ভাগ ছিনিয়ে নিতে ওৎ পেতে আছে বলে মনে করে। আর শ্রমিক ভাবে তার গায়ের সমস্ত রক্ত চুষে নিয়ে এই শিল্পপতি তার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলছে। এ ডাকু-লুটেরা তাই একে খতম করতে হবে। এ যেন যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যেক পক্ষ তার প্রতিপক্ষের বুকের নিশানায় সঙ্গীন উঁচু করে আছে।

এই মনোভাবের কিছুটা বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই, আজ পৃথিবী ব্যাপী হরতাল, ধর্মঘট ও ঘেরাও অভিযানের যে সয়লাব চলছে তার মধ্যে। সকলেই চেষ্টা করছে কি করে তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়। তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতিতে যেভাবে হরতাল ও ঘেরাও অভিযান চলছে, এর কোন হিসেব নেই। ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে বৃটেনের ডক শ্রমিকগণ যে ধর্মঘট শুরু করে তা কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পরে বিশ হাজার ডক শ্রমিকের সাথে সত্তর হাজার রেল শ্রমিক যোগ দিলে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিককালেও বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক ধরনের ধর্মঘট হয়ে চলছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়।

মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কোন সুনির্ধারিত অধিকার নেই। এর জন্মই হয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত রাখার নিমিত্ত। তাই ধনবাদী অর্থনীতিতে শ্রমিকদের মনে করা হয় একটি উৎপাদন যন্ত্র। শ্রমিকদিগকে নিজেদের জান ও মালের সুবিধা আদায়ের জন্য এক চিরন্তন দর কষাকষির মধ্যে লিপ্ত হতে। যতটুকু পারে সংগ্রামের মাধ্যমেই তারা তা আদায় করে নেয়।

বর্তমানে বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকরা যে কিছুটা সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোন অন্তর্নিহিত গুণের কারণে নয় বরং পুঁজিপতিরা তা দিতে বাধ্য হয়েছে। নিজেদের সুদ আদায় করতে যেয়ে অন্যের তাজা মাংস ছুরি দিয়ে তুলে নেওয়ার জঘন্য শাইলকি মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুঁজিপতিরা কখনও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারে না—তাদের থেকে এ আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে মনীষিগণের প্রচেষ্টা

শ্রমিকদের প্রতি শিল্পপতিদের অন্যায়-আচরণ অতি সুস্পষ্ট। ইউরোপীয় শিল্প জীবনে এই অন্যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক দুষ্ট বিষ-ক্ষতের মত বিরাজ করতে থাকে এবং তা একটি প্রধানতম সামাজিক সমস্যারূপে দেখা দেয়।

শ্রমিকদিগকে এহেন দুরবস্থা থেকে মুক্তি দানের জন্য, তাদের অবস্থা উন্নয়নের ব্রত নিয়ে এই সময় নানা মনীষী স্ব স্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলেন।

সোশ্যালিজম বা সমাজতন্ত্র কথাটির যিনি প্রথম প্রয়োগ করেন তিনি হলেন ম্যানচেষ্টারের সুতা কলের মালিক রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮)। তিনি নিজে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করতেন, কিন্তু কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের অবস্থা দর্শনে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন। নিউলানার্ক নামক স্থানে এক আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন এবং সেখানে সমবায় বিপণী কায়েম করে, অসুস্থ ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে ভাতা দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করে তাঁর নিজের কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা কিছুটা উন্নত করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু যেহেতু এ এক বেসরকারী একক প্রচেষ্টা ছিল, তাই সমাজে তা কোন সার্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে নি।

'সেণ্ট সাইমন (১৭৬০—১৮২৪) ও চালর্স ফুরিয়ে' (১৭৭২-১৮৩৭) সমস্ত পণ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে উৎপাদিত সামগ্রী সকল মানুষকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব করে মেহনতি জনদের অবস্থা উন্নয়নের চেষ্টা করলেন।

এরপর প্রচেষ্টা চালালেন লুইব্রাঙ্ক, নৈরাজ্যবাদী জোসেফ প্রুধো। (১৮০৯—১৮৬৫) মিখাইল বাকুনীন (১৮১৪—১৮৭৬) প্রমুখ মনীষী। এত করার পরও শ্রমিকদের তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হল না। পূর্বের মত পুঁজিপতিদের পকেট অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা ফুলে ফেপে উঠছিল, আর শ্রমিকদের দিন দিন অন্ধকারের দুর্গম অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে কার্ল মার্কস্ (১৮১৮—১৮৮৩) ও ফ্রেডারিক এঙ্গলস (১৮২০—১৮৯৫) দুই দার্শনিক বন্ধু ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদী ইশতিহার বের করে, পুঁজিবাদ ধ্বংস করার নিমিত্ত সকল শ্রমিককে এক হওয়ার আহ্বান জানান। মার্কস ইতিহাসের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, দুনিয়ার সমস্ত বিপ্লব, সামাজিক রূপান্তর

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক কারণেই সংঘটিত হয়—ন্যায়-নীতির জন্য নয়। আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিণতিতে যে, 'প্রলেতারিয়েত' বা মেহনতি জনতার জন্ম হয়েছে, তারা ঐতিহাসিক সূত্রানুযায়ী ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিয়ন্তা হবে। তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় এসে গিয়েছে। আর তাদের ধ্বংস-যজ্ঞের উপর মেহনতি জনতার রাজত্বের ভিত্ গড়ে উঠবে। অচিরেই শ্রমিকশ্রেণী দ্বারা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হবে, যেখানে কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক বৈষম্য, শোষক পুঁজিপতি বা সরকার থাকবে না বরং প্রত্যেকেরই যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ নেওয়া হবে এবং সকলের প্রয়োজনানুযায়ী ভরণ-পোষণ করা হবে।

মার্কসের ইতিহাস-দর্শন এ কথাই ব্যক্ত করে যে অন্যায় পুঁজিবাদের আপনা-আপনি অবসান হয়ে যাবে। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিপতিদিগকে ক্ষমাচ্যুত করবে এবং তারা নিজেরাই পুঁজি ও উৎপাদন পদ্ধতির কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে।

পাশ্চাত্যের খোদায়ী সত্যের আলো-বিবর্জিত মুমূর্ষু সর্বহারাদের কাছে এই মোহময় দাঁবিগুলি প্রচণ্ড আবেদন সৃষ্টি করে এবং তাদের কাছে এগুলি আশার বাণীরূপে প্রতিভাত হতে থাকে। শ্রমিক সংঘগুলি মার্কসীয় দর্শন ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে এবং মার্কসের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৬/৪৭ এর মধ্যে 'প্রথম আন্তর্জাতিক' শ্রমিক সংগঠন গঠন করা হয়।

কিন্তু মার্কস সফল হতে পারলেন না। তাঁর দাবিগুলিতে কোন অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকায় কিছু দিনের মধ্যেই 'প্রথম আন্তর্জাতিক'-এ ভাঙ্গন ধরে এবং শেষ পর্যন্ত খতম হয়ে যায়। পরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠন করার পরও এর ভাগ্যে পূর্বের অবস্থাই ঘটে।

এদিকে 'জার' কবলিত রাশিয়ায় শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের অবস্থা দিন দিন হীনতর হতে থাকে। পুঁজিবাদীরা নিজেদের আসন মজবুত করে নিয়ে অত্যাচারী 'জার' সম্রাটের ছত্রছায়ায় সাধারণ মানুষদেরকে অবর্ণনীয়ভাবে শোষণ করতে থাকে। সেখানে তাদের ভোট দেওয়ার বা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করারও কোন অধিকার ছিল না।

মানুষ ঐ অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের জন্য হাহাকার করতে লাগল। চিন্তাশীল মনীষীগণ নূতন এক আদর্শ পথের সন্ধানে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। রাশিয়া তখন এক ক্রান্তিকালীন অবস্থার ভিতর দিয়ে এগুচ্ছিল।

www.pathagar.com

ঐ সময় 'মার্কসের' চিন্তাধারা রাশিয়ায় প্রবেশ করে এবং তাতে সকলেই অনুপ্রাণিত হন। সমাজতন্ত্রীদের প্রথম বিপ্লবী নায়ক অর্থ-নীতিবিদ ভি. আই. লেনিনের উপর মার্কসের শিক্ষা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার স্বাভাবিক শক্তির সহায়তায় মার্কসের অনেকগুলি মূলনীতি এড়িয়ে গিয়ে একটি কার্যোপযোগী ধারা বের করেন; এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করতে শুরু করেন।[১১]

সে সময়ে 'জারের' স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার ফলে রাশিয়ার সর্বত্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। অধীনস্থ জাতিগুলি অস্থির হয়ে ওঠে; মধ্য-বিত্ত শ্রেণী অসন্তোষ প্রকাশ করে; কৃষকেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে দেয়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ১লা মার্চ স্বৈরাচারী সরকার এক হুকুমনামা জারি করে ধর্মঘটিদের কাজে ফিরে আসার আদেশ দিলে বিপ্লবের গতি আরও ত্বরান্বিত হয়। ধর্মঘট-কারীরা এই আদেশ মানতে অস্বীকার করে। সেনাবাহিনী জারের

---

১১. ঐ সময় রাশিয়ায় এক নতুন জীবনাদর্শের আবেদন অনুভূত হতে থাকে। প্লাখনভ (Palkhanove)-এর মাধ্যমে সে সময়ে মার্কসের ধ্যান-ধারণা সেখানে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ঐ সময় সাম্যবাদী ইসলামের প্রকৃত রূপটি যদি কোন মুজাহিদ সত্যিকারভাবে রাশিয়ার নিগৃহীত লাঞ্ছিত জনগণের কাছে তুলে ধরতেন, তবে আজ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না হয়ে ইসলামের সুষ্ঠু ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত হত। পরের ঘটনাবলী দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়। ভারতের বিখ্যাত মনীষী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বলেন—'আমার রাশিয়া অবস্থান কালে লেনিনের সাথে সাক্ষাৎ হলে কথা প্রসঙ্গে তার কাছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশ্লেষণ করি। এস আলু নাকা মাযা' ইয়ুনফিকু' না কুলিল আফওয়া "হে নবী' আপনার কাছে লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করে যে তারা আল্লাহ্র পথে কি ব্যয় করবে। আপনি বলে দিন প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু বিলিয়ে দাও।''

তখন লেনিন অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—"আরো আগে যদি কুরআনের এই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতাম, তাহলে আমাদের 'কম্যুনিজম' প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কোন আবশ্যকই ছিল না।"

[পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম—কৃত মাওলানা শামসুল হক আফগানী।]

www.pathagar.com

উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তারাও ধর্মঘটিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। তারা তখন সৈন্য ও শ্রমিকদের মিলিতভাবে এক বৈপ্লবিক পরিষদ বা সোভিয়েত গঠন করে। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই মার্চ প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন আকস্মিকভাবে জার সম্রাট 'নিকোলাস' ক্ষমতাচ্যুত হন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক সরকার পরিস্থিতি যথাযথভাবে বুঝতে পারেন নি। দেশে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যাগুরু চরমপন্থী বলশেভিক দল এক্ষণে পরিস্থিতিকে সুবিধাজনক মনে করে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ও ১৯১৭ খৃস্টাব্দে নভেম্বর মাসে ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে সামরিক সরকারকে পদচ্যুত করে গদি দখল করে নেয়। এমনি ভাবে রাশিয়ায় মেহনতি জনতার স্বর্গরাজ্য বলে উদ্ভব হয় কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গোড়া।

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ এবং চীন ও কিউবাতে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব কায়েম হয়।

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক

হাজারো লহুর বন্যা বহায়ে, অনেক আশার পিদিম জ্বালিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর রাজত্ব কায়েম করার আবেগময় বাণী শুনিয়ে, লাখো মানুষের কবরের উপর শ্রমিকদের তথাকথিত যে স্বপ্ন রাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়; তা সত্যই কি মেহনতিদের তথা সর্বহারাদের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পেরেছে? অন্যকথায়–সমাজতন্ত্র, দাবির বেড়াজালে নয়; বাস্তবিক ভাবেই কি পুঁজিবাদী স্বৈরাচারের ফলে যে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, এদের সমস্যার কোন ন্যায়ানুগ ও কার্যোপযোগী সমাধান বের করতে পেরেছে?

আজকের পৃথিবীর এ এক চরম প্রশ্ন—চরম জিজ্ঞাসা।

একটি পর্যবেক্ষণশীল মন নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কার্যধারা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে আমাদেরকে গভীরভাবে হতাশ হতে হয়।

গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, আজ পর্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক যত আন্দোলন হয়েছে; যতগুলি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সবগুলিতেই কতিপয় মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সাধারণ সর্বহারাদেরকে স্বাচ্ছন্দের আশা দিয়ে, তাদেরকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। পুঁজিবাদীরা রাজতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে না পেরে গণতন্ত্রের নামে; আর গণতন্ত্র এলে বঞ্চিতদের সার্বিক সুবিধা হবে—এর প্রলোভন দিয়ে সাধারণ মানুষকে সামন্তদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। পরিণামে গণতন্ত্র এলে এর সমস্ত সুবিধার সিংহভাগটাই তারা হাতিয়ে নেয়;—জনসাধারণ কেবল তাদের উচ্ছিষ্টই চাটবার সুযোগ পায়। ফলে মানুষের অবস্থা কেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তা আমরা পূর্বের আলোচনা দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি।

ঠিক তেমনি কিছুসংখ্যক লোক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থ আদায়ের প্রতিবন্ধক দেখে, ঊনবিংশ শতকের শ্রমিকদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে, এদেরকে অনাবিল শান্তি—সুখের আশা দিয়ে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে নিজেদের স্বার্থ

www.pathagar.com

আদায় হয়ে যাওয়ার পর সর্বহারাদের কথা ভুলে যায়,—যাদেরকে নিজ সাফল্যের উচ্চমার্গে ওঠার পথে সোপান হিসাবে ব্যবহার করেছিল। আর আজ সাধারণের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই বিদ্যমান।

আমরা জানি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসহনীয় বর্বরতার দরুন সাম্যবাদ নামে চরম বামপন্থী আন্দোলনের জন্ম হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চরম দক্ষিণপন্থী হওয়ায়, যেমন মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নি ঠিক তেমনি বামপন্থী সাম্যবাদ এক প্রান্তিক মনোভাবাপন্ন সংগঠন। তাই এ-ও টিকে থাকার জন্য আসে নি—খতম হয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছে। কারণ প্রান্তিকতা মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ, প্রকৃতির খেলাফ। আর অপ্রাকৃত জিনিস বেশীদিন স্থায়ী হয় না। কারও প্রতি ক্রোধোন্মত্ত হওয়া যেমন সাময়িক, ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জাতক্রোধের কারণে, এর প্রতিক্রিয়ায় যে প্রতিক্রিয়াশীল চরম বামপন্থী আন্দোলনের জন্ম তা-ও সাময়িক। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'বাতেল—অপ্রাকৃত মানবতা-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছে—এর স্থায়িত্ব নেই।"[১১]

তাই মার্কসিজমের নামে যে সব দেশের জন্ম হয়েছে, তারা বাস্তবভিত্তিক কাজ করতে যেয়ে পদে পদে ঠেকেছে—সামনে চলতে পারে নি। মার্কসের অনেকগুলি মূলনীতি বাধ্য হয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয়, নইলে যে কার্যোপযোগী ব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আজ সমাজতান্ত্রিকদের মনে বিরাট জিজ্ঞাসা —"মার্কসের মূলনীতিগুলি কি পরিবর্তনীয় নয়?" 'লেনিনের' কাল হতে যে পরিবর্তনের ধারা চালু হয় তা 'স্টালিনের' আমলে পরিপুষ্ট হয়ে আজ 'কোসিগিনের' সময়ে একেবারে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অধ্যাপক 'রস্টোর' ভাষায়ঃ

> লেনিন ও তার পরবর্তীরা কার্যত হেগেলকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন; তারা মার্কসকে, উল্টে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক হেতুবাদ তাদের বিশেষ কাজে আসে নি; কিন্তু ক্ষমতার হেতুবাদ বেশ ভাল ভাবেই শূন্যস্থান অধিকার করেছে।"[১২]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জালিম পুঁজিপতিরা যে ভাবে শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়েছিল, আজ এর চেয়েও মারাত্মকভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকদের শোষিত হতে দেখতে পাই।

---

১১. ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুক্কা।

১২. অর্থনৈতিক বিকাশের সোপান—কৃত অধ্যাপক ডবলু, ডবলু রস্টো।

www.pathagar.com

কারণ মার্কস সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কি রূপরেখা হবে, তার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে যান নি। পুঁজিবাদের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করেছেন সত্য, কিন্তু সমাজতন্ত্রের রূপরেখা নিয়ে তেমন আলোচনা করেন নি। এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন তার 'প্রোগ্রামের সমালোচনা' বইয়ে। সেখানেও সমাজতন্ত্রের কোন অর্থনৈতিক নক্সার বর্ণনা করা হয় নি।"[১৩]

তার মতে কম্যুনিজমের আসল প্রোগ্রাম হল বিপ্লব। আর অর্থনীতি? তা আপনা আপনিই হয়ে যাবে—কিভাবে হবে তার কোন জবাব নেই। তাই লেনিন যখন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করেন তখন কম্যুনিজমের সুস্পষ্ট কোন প্রোগ্রাম তাঁর সামনে না থাকায়, তাকে অবচেতনভাবে পুঁজিবাদের দিকেই মোড় নিতে হয়েছে। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদেরই ওপিঠ মাত্র।

মার্কসিজমের মূল কথাই ছিল, "প্রত্যেকের নিকট থেকে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ নেওয়া হবে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।" কিন্তু 'মার্কসিজম' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দেড় যুগের মধ্যেও যখন কার্যকরীভাবে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তখন ১৯৩৬ সনে বাধ্য হয়ে রাশিয়ার শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন আনতে হয়। বলতে হয়, প্রত্যেকের নিকট হতে তার সাধ্যানুযায়ী কাজ নেওয়া হবে এবং তার কাজের পরিমাণ ও গুণগত দিক বিচার করে তাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।" আমরা জানি, পুঁজিবাদী সমাজের মূল কথাটাও তাই।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আজ বহুনিন্দিত পুঁজিবাদের দিকেই নিজেদের উল্টোরথ চালিয়ে নিয়ে চলেছে। এই সত্যটিই রাশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাসের' মুখপাত্র 'সোভিয়েট দেশের একটি নিবন্ধে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'সোভিয়েট রাশিয়ায় কি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়—"তাদের বাস্তব প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে এখনও পুরাপুরি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারণ তারা সমাজ হতে নিজেদের প্রয়োজনানুযায়ী নয় বরং নিজেদের শ্রম ও মেহনতানুযায়ী অংশ পেয়ে থাকে।"

মজুরদের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা সম্পর্কে এ এমন এক রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি, যা আজ অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল হতে অর্থনৈতিক সাম্যের শ্লোগান দিয়ে আসছে।

---

১৩. মাসিক চেরাগেরাহ, সোশ্যালিজম নম্বর—করাচী।

www.pathagar.com

১৯৬০ সনের ৫ই মে সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতা দানকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ত ঘোষণা করে ফেললেন যে, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নয়। তিনি বলেন ঃ

> আমরা মজুরির মধ্যে তারতম্য অবসানের বিরোধিতা করি। আমরা মজুরিতে সমতা এবং তাকে একই সমতলে আনার স্পষ্ট বিরোধী। আর এটাই লেনিনের শিক্ষা।[১৪]

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সকল ডিক্টেটর আমলা-তন্ত্রের উপর চরমভাবে নির্ভরশীল। তাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ডিক্টেটরী শাসন-ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে আজ এক শক্তিশালী আমলা-গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। যারা পুঁজিপতিদের মতই, এমন কি তার চেয়েও ভয়াবহভাবে নির্বিচারে সাধারণ শ্রমিক তথা সর্বহারাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে থাকে, যাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মান মজুরদের তুলনায় অনেক উচ্চে। ধনবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি ও মজুরদের মধ্যে যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এর চেয়েও মারাত্মকভাবে তা আজ সেখানে বিদ্যমান। বিখ্যাত সোশ্যালিস্ট লেখক 'এম. ওয়াই ইউয়ন' ১৯৩৭ সনের মজুরি পার্থক্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

সাধারণ মজুর	১১০ হতে ৪০০ রুবল
মধ্যস্থানীয় অফিসার	৩০০ হতে ১০০০ রুবল
বড় অফিসার	১৫০০ হতে ১০০০০।[১৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এক রুবল আমাদের মুদ্রায় মাত্র এক টাকা নয় পয়সার সমান।

ক্রুশ্চেভের আমলে সংশোধনী অভিযান চালানো হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার পরও সেখানে ফ্যাক্টরী-ডিরেক্টর ও সাধারণ মজুরের মধ্যে বেতনের হারে ১৫ ঃ ১ অনুপাত বিরাজমান। আর তা-ও ১৯৬২ সনের পরে সংশোধিত ব্যবস্থা কার্যকরী হ'লে তবে বাস্তবায়িত হবে।

জনৈক রুশীয় অর্থনীতিবিদ মিঃ এস, ভস্কী সংশোধিত মজুরি-নীতির আঙ্গিক ধারা লিখতে যেয়ে বলেন, সংশোধনকৃত হওয়ার পর ছয়

১৪. সোভিয়েট ওয়ার্ল্ড, মাসিক চেরাগেরাহ, সোশ্যালিজম নম্বর—করাচী।

১৫. মাসিক চেরাগেরাহ, সোশ্যালিজম নম্বর—করাচী।

www.pathagar.com

রকমের পে-স্কেল হবে এবং এর ভিতরও বিভিন্ন প্রকারের চল্লিশটি গ্রেড থাকবে।"[১৬]

ঠিক তেমনি পেনসনের ব্যাপারেও বৈষম্য বিদ্যমান। কয়লার ধোঁয়ার সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশটি বছর মেহনত করার পরও একজন শ্রমিকের ভাগ্যে জোটে মাসিক মাত্র পঁয়ত্রিশ রুবল। আর এদিকে আমলা শ্রেণীর সমস্ত জীবন আয়াসে কাটানোর পরও পেনসনের সময় মাসিক পনর শত রুবল এবং বিনা ভাড়ায় বাড়ী পেয়ে থাকে।[১৭]

রাশিয়ায় যে প্রচণ্ড দ্রব্যমূল্য বিরাজমান তাতে একজন চারশ বা পাঁচশ রুবল নিয়ে কি করে নিজের জীবন চালাতে পারে? বিখ্যাত পাকিস্তানী সমাজতান্ত্রিক নেতা মোবারক সাগের রুশ সফর করে এসে বলেন, "সেখানে একশত পনর রুবল দিয়ে আমি একটি জামা খরিদ করেছি।" পাকিস্তানের প্রাক্তন শিল্প উজির জনাব আলতাফ হোসেন মরহুম রাশিয়ায় সফর করে এসে লিখেন,—"মধ্যম ধরনের এক জোড়া জুতা পাঁচশ রুবল, সোয়া সের দুধ চার রুবল এবং এক ডজন ডিম চৌদ্দ রুবলে সেখানে পাওয়া যায়।"[১৮]

এমন অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের মধ্যে একজন যদি হাজার রুবলও উপার্জন করে তবুও তার জীবন কতটা দুর্বিসহ হয়ে উঠতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

যে সমাজতন্ত্র একদিন শ্রেণী-সংগ্রামের অভিশাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার দাবি নিয়ে উঠেছিল আজ সেখানে শ্রমিকদেরকে পর্যন্ত বিভিন্ন আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছে।[১৯]

আমলাতন্ত্রের সামনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মজুর শ্রেণী একান্ত অসহায়। সমাজতন্ত্র ও মার্কসিজমের নাম ভাঙিয়ে যেভাবে তাদের শোষণ চালানো হচ্ছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা মিলাভন জেলাস লেখেন ঃ

> সেখানে (রাশিয়ায়) রাজনৈতিক আমলাতন্ত্র আজ জাতীয় আয় সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে নিয়েছে। তারা জাতি ও সমাজের (সুখ-স্বাচ্ছন্দের) নামে সমস্ত জাতীয় উৎপাদন হাতিয়ে নেয়; কিন্তু

১৬. Pay scale working day and wages in the U. S. S. R
১৭. ডাঃ ব্যাসিলে, 'রুশীয় সমাজতান্ত্রিক দেশ।'
১৮. সোশ্যালিজম কী না কামিয়াঁ—কৃত আসাদ গিলানী।
১৯. সোশ্যালিজম কী না কামিয়াঁ—কৃত আসাদ গিলানী।

www.pathagar.com

এরা একটুও মনে করে না যে, যাদের ওপর এতদিন রাজত্ব করে চলেছি তাদের অধিকার তাদেরকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।[২০]

তিনি আরো বলেন ঃ

সোশ্যালিস্ট দেশ আর 'থিয়ক্রেসী' বা পোপীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রভেদটাই বা কি? সোশ্যালিজমের নামে সেখানে তারা নিজেদের লিপ্সাই পূরণ করে চলেছে। আর এতদিন পাদ্রীরা খোদার নাম নিয়ে মানুষের উপর যা করে এসেছে সেখানে তারা সমাজতন্ত্রের নামে তা-ই করে চলেছে।[২১]

এরই ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে এমন এক শাসকচক্রের সৃষ্টি হয়েছে যাদের জীবনযাত্রা পুঁজিপতিদের মতই কিন্তু শ্রমিক তথা সর্বহারাদের অবস্থা দিন দিন তলিয়ে যাচ্ছে। সাম্যবাদী লেখক লুইফিসার রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে বিবৃতি দেন ঃ

স্টালিন ত রুজভেল্টের মতই আয়াসে থাকেন; কিন্তু সেখানে মজুরদের অবস্থা পুঁজিবাদী আমেরিকার মজুরদের চেয়েও নিম্নমানের।[২২]

এমনিভাবে কারখানা-ডিরেক্টরের মাধ্যমে মজুরের শোষণ খানিকটা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সমাজতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের অন্যান্য সদস্য। ফ্রী ঔষধ ও ব্যবস্থা প্রদান, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা, আমদানী ট্যাক্স অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেয় ঋণ কালচারাল ট্যাক্স ইত্যাদির নামে তার রক্ত পানি করা কামানো বেতনের একুশ ভাগ তারা কেটে নেয়। এতে বার হাজার মিলিয়ন রুবল আমলাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। আর সেখান থেকে শ্রমিকদের জন্যে খরচ করা হয় মাত্র ছ'হাজার পাঁচশত রুবল।[২৩]

এ শুধু রাশিয়ার অবস্থা নয়; বরং সবগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশের অবস্থা। আজকের চীন রাশিয়াকে সংশোধনবাদী বলে ঠিক সেই ভাবে গাল দিচ্ছে, যে ভাবে এতদিন পুঁজিবাদী দেশগুলিকে দেওয়া হতো; সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থাও তেমন কোন ভাল নয়।

২০. 'দি নিউ ক্লাস'—কৃত মিলাভন জেলাস।
২১. সোশ্যালিজম কী না কামিয়াঁ—কৃত আসাদ গিলানী।
২২. সোশ্যালিজম কী না কামিয়াঁ—কৃত আসাদ গিলানী।
২৩. ইশতিরাকিয়ৎ রুশ কী তজরবা গাহ মে—কৃত আসগর আলী আবেদী।

www.pathagar.com

ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে ব্রজকিশোর শাস্ত্রী সরকারী আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। তিনি সেখানকার মজুরদের অবস্থা জানার জন্য বিশেষ কৌতূহলী হন। ছ'সপ্তাহকাল ব্যাপী চীন সফরের পর মজুরদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

> এখানে আমরা হালের সঙ্গে বলদের পরিবর্তে মেয়েলোককে বাঁধা দেখেছি। সে কত মর্মান্তিক ও অমানুষিক দৃশ্য! মেয়েলোক..... তাকে হালের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য অচেতন হয়ে পড়লাম। চীনের মেহনতি লোকদের দ্বারা যে ভাবে কাজ করানো হচ্ছে তা দেখে অনুকরণ করা বা তা হতে প্রেরণা লাভ করা দূরের কথা বরং বড়ই দুঃখ ও বেদনা পেলাম। মানুষ আর যা-ই হোক মানুষ—জন্তু নয়। কোন দেশের উন্নয়নের ব্যাপারে জন্তুদের স্থানে মানুষকে ব্যবহার করা মানুষের উপর নির্মম জুলুম—চরম অমানুষিকতা ভিন্ন আর কি হতে পারে ?[২৪]

এত খাটুনির পরও এদের দুমুঠো অন্ন যোগাড় করার মত পারিশ্রমিক মেলে না। চীনের একজন শ্রমিক এক হাজার থেকে পনর শত ইয়ান্ কিংবা পঞ্চাশ ইউনিট মজুরি পেয়ে থাকে। এক ইয়ান্ আমাদের মুদ্রায় এক পয়সার চেয়ে কিছু বেশী, আর এক ইউনিট পঞ্চাশ পয়সা বা এর চেয়ে কিছু বেশী।

এই পয়সা নিয়ে বাজারে গেলে একজন শ্রমিকের চেতনাহরণকারী দ্রব্যমূল্যের সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহোদয় বলেন ঃ

> নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ভারত অপেক্ষা চীনে অনেক বেশী। চা'ল, কাপড়, তেল ও লবণের মূল্য ভারত অপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের মূল্য সম্পর্কে ধারণা করাও কঠিন।[২৫]

যেখানে আমলাতন্ত্র শিকর গেড়ে বসে, সেখানে ঘুষ ও অন্যান্য রকমের অবাঞ্ছিত শোষণ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। আমরা আমাদের দেশেই তা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। আর সাম্যবাদী শাসন ব্যবস্থা আমলাতন্ত্রের উপরই নির্ভরশীল। সাম্যবাদীরা আদর্শের যত ফাঁকা

২৪. ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার—কৃত মাওঃ আবদুর রহীম।
২৫. ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার—কৃত মাওঃ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

বুলিই আউড়াক না কেন তা বাস্তব সত্য। তাই দেখা যায়, সাধারণ শ্রমিকরা সেখানে নিজের পেটের ভাতটুকু যোগাড় করতে গিয়ে আমলাদের খামখেয়ালী মর্জি যোগাতে প্রাণপাত করছে। পরিদর্শক বা ইন্সপেক্টর ব্যক্তিগত কারণেও যদি কারও উপর নারাজ হয়ে যায় তবে তার আর দুর্দশার অন্ত থাকে না। সমাজতন্ত্রের শত্রুরূপে অভিহিত করে তার যাবতীয় রেশনকার্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তখন উপবাসে ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া তার কোন গত্যন্তর থাকে না। এমন কি প্রতিক্রিয়াশীলদের চর বলে চিহ্নিত করে তাকে শাস্তিও দেওয়া হয়।

এই বাস্তব সত্যটির দিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে সমাজতন্ত্রী প্রকাশনী মর্নিং স্টার বলেন ঃ

> স্টালিনের ব্যক্তি পূজার আমলে তার ব্যক্তিত্বের উপর ব্যঙ্গ-কারীদেরকেও প্রতিক্রিয়াশীলতার অভিযোগ এনে শাস্তি প্রদান করা হত।[২৬]

এমনিভাবে নিষ্পেষিত হওয়ার পরও তাদের কোন অধিকার নেই একথা মুখে ফুটে বলার। তারা স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ান গঠনের ন্যূনতম অধিকার হতেও বঞ্চিত। শ্রমিকরা আজ সেখানে পর্যায়ক্রমে তিনটি শ্রেণীর কাছে শোষিত হচ্ছে—সরকারী নিযুক্ত ফ্যাক্টরী-ডিরেক্টর, কমুনিস্ট পার্টির সদস্য এবং তল্পীবাহক সরকারী ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা। শ্রমিকদের স্বাভাবিক অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সেখানকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির করণীয় কিছুই নেই। তারা শুধু শ্রমিকদেরকে বর্ধিত হারে উৎপাদনের নিমিত্ত উৎসাহ যোগানোর হাতিয়ার মাত্র।

এত কাজ করেও পায় না তারা পেট পুরার মত সুস্বাদু খাদ্য। সরকারী নঙ্গরখানা হতে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তা মুখে তোলা মাত্র তেতো হয়ে যায় মুখ। ১৯৬৬—৭০ এর পাঁচশালা পরিকল্পনার রিপোর্ট দিতে গিয়ে রুশীয় প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন এই রূঢ় সত্যটিই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন ঃ

> সরকারী রেস্তোরাগুলোর প্রতিও মারাত্মক অবহেলা প্রদর্শন করা হচ্ছে। ক্যান্টিন ও রেস্তোরা অফিসারদের এখন আর খাদ্য-দ্রব্যের স্বল্পতার বাহানা করার উপায় নেই, তবু সেগুলোতে রান্না অত্যন্ত বিস্বাদ হয়; পরিবেশনও মনোমত হয় না।[২৭]

---

২৬. কমুনিজম কিয়া হায়, মর্নিং স্টার প্রকাশনী—করাচী

২৭. 23rd Congress of the C. P. S U. 1966
মাসিক চেরাগেরাহ, সোশ্যালিজম নম্বর—করাচী।

www.pathagar.com

মার্কস পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা করতে যেয়ে বলেছিলেন—শ্রমিকরা যা উৎপাদন করে এবং মজুরিরূপে যা লাভ করে—এ দু'য়ের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা দ্বারাই অতিরিক্ত সম্পদ বা বাড়তি মূল্য গড়ে ওঠে। আর পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বঞ্চিত করে সমুদয় অতিরিক্ত সম্পদই হাতিয়ে নেয়।

আজকালকার প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমরা এর চরম নিদর্শন দেখতে পাই। সেখানে শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিকদের যে প্রতিদান দেওয়া হয়ে থাকে তা পরিশ্রমের তুলনায় অনেক কম। পক্ষান্তরে শ্রমিকদের তাজা খুনের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠে, তার সবটুকুই ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয় সরকারী নিয়ন্ত্রণযন্ত্রীরা। আর শ্রমিকগণ অসহায় হয়ে দেখে, তাদের রক্ত আমলাদের পকেটে ছোপ ছোপ হয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলেছে। তাদের হাড্ডি দিয়ে বানানো ভিতের উপর প্রচুর আয়েশে এরা মজা লুটে চলেছে।

প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা মিলাভন জেলাসের ভাষায়ঃ

> যে পুঁজিপতি শ্রেণীকে খতম করার এক উচ্চ আশা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা আজ অতি শক্তিশালী একনায়কত্বের অধিকারীদের হাতে নিজের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ সঁপে দিয়ে এক চরম পরিণতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মালিকানা অধিকারের এ শরীরকবিহীন সরকারী কর্মচারীরা নিজেরাই সমস্ত জাতীয় আমদানী বন্টন করে, মজুরী নির্ধারণ করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের খবরদারী করে এবং সমস্ত সম্পদ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। আর সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে দেখে পার্টি কর্মকর্তারা অনেক বেশী ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে চলেছে অথচ এরা মেহনতের ধার ধারে না—এদের মেহনত করতে হয় না।[২৮]

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বাধ্যতামূলক শ্রম শ্রমিকদের উপর আর এক অভিশাপ নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন কয়েদখানা থেকে এদেরকে যোগাড় করতে হয়, মজ্জিমত এ'দের দ্বারা মেহনত করানো হয় কিন্তু প্রতিদানে এ'রা কিছুই পায় না—বেগার খাটতে হয় এদের। স্টালিনের আমলে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত ছিল এই

---

২৮. 'দি নিউ' ক্লাস—কৃত মিলাভন জেলাস্।

www.pathagar.com

ব্যবস্থা। সাম্যবাদের সমর্থক প্রখ্যাত রুশীয় লেখক ডাঃ এক্সনভ লেখেন ঃ

> আমাদের শিল্প কারখানার উৎপাদন অনেকটা বিরাট কয়েদী বাহিনীর উপর নির্ভরশীল, যাদের সংখ্যা অনেক সময় কোটির সীমাও ছাড়িয়ে যায়।[২৯]

লেখক সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের কথা গর্বভরে উল্লেখ করতে যেয়ে অবচেতনভাবেই আমাদেরকে প্রকৃত অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আজকার বিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থলেও সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থা অতীতের দাস শ্রেণীর মতই। প্রাচীনকালে এমনিভাবে নিযুক্ত দাস শ্রমিকদের রক্তের উপরই তাদেরকে বেগার খাটিয়ে, পিরামিড, চীনের প্রাচীর আর ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের ভিত দাঁড় করানো হয়েছিল। পিরামিড খুলে দেখলে আজও হয়ত এদের রক্তের আস্বাদ মিলবে। আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর-ই পুনরাবৃত্তি চলেছে। শ্রমিকদের গায়ের মাংস খুবলে খুবলে তুলেই আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্পদের অতুল সৌধ গড়ে তুলেছে; আর তা মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত নয় মারণাস্ত্র উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ব্যয় করে চলেছে। এর-ই পর্যালোচনা করতে যেয়ে মিলাভন জেলাস বলেন ঃ

> সমাজবাদী দেশগুলির সামগ্রিক কার্যক্রম দেখে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কি করে প্রাচ্যের প্রাচীন স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলিতে ফেরাউন ও অন্যান্য শাহানশাহরা দেবতার মর্যাদা পেয়েছিল, আর কি করেই বা তারা দৈত্যের মত বড় বড় পিরামিড কেল্লা, কবরস্থান……… এবং ফসিল ইত্যাদি নির্মাণ করতে পেরেছিল।[৩০]

প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশেই রাশিয়া অনুসৃত কার্যক্রম চলেছে। ব্রজকিশোর শাস্ত্রী চীনা শ্রমিকের কথা আলোচনা করতে যেয়ে বলেন ঃ

> এর (শোষণের) প্রতিবাদ করার ভাষা এদের নেই। মজুরদের বেশীর ভাগ বহু দূর-দূরাঞ্চল হতে আনা হয়েছে। বর্তমান চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার এদের কোন অধিকার নেই। মূলত চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ও চেয়ারম্যান 'মাও' এখানে বাধ্যতামূলক শ্রমের রাশিয়া পরীক্ষিত কার্যক্রম প্রয়োগ করে চলেছেন।[৩১]

---

২৯. ইশতারাকিয়াত রুশ কী তজরবা গাহ মে—কৃত আসগর আলী আবেদী।

৩০. 'দি নিউ ক্লাস'—কৃত মিলাভন জেলাস।

৩১. ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার—কৃত মাওঃ আবদুর রহীম।

www.pathagar.com

অনেক সময় নির্ধারিত শ্রমের যোগান পূরণের নিমিত্ত গোয়েন্দা পুলিশদের দ্বারা নিরপরাধ সাধারণ মানুষদেরকে ধরে এনে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। রুশীয় প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে জানা যায় সমস্ত শ্রমশক্তির প্রায় দশ থেকে পনর ভাগই গোয়েন্দা পুলিশ মারফত সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে বয়সের কোন বাছ-বিচার করা হয় না। সতেজ প্রাণ কিশোর থেকে নিয়ে থুত্থুড়ে বুড়ো পর্যন্ত এতে শামিল।[৩২]

পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সামগ্রিক উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় তাল মেলাতে যেয়ে কম্যুনিস্ট কর্মকর্তারা এত হন্যে হয়ে উঠেছে যে, তারা মেয়েদেরকে দিয়েও যে কোন কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ আদায় করে নিতে দ্বিধা করে না। কয়লা, লোহা ইত্যাদির খনিতে মেয়েদেরকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। জনৈক রুশীয় প্রাদেশিক কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী বলেন ঃ

> আমাদের বহু খনিতে মহিলাগণ মৌলিক ও চূড়ান্ত দায়িত্ব পালনে লিপ্ত রয়েছেন। অনেক কয়লার ট্রাস্টে মোট কর্মীর মধ্যে মহিলাদের অনুপাত ৬০ ঃ ১৫০।[৩৩]

এদের স্বার্থসিদ্ধির পথে মেয়েদের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই—আলাদা কোন মর্যাদা নেই। আজ রাশিয়ার শ্রম-শক্তিতে শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগই নিযুক্ত রয়েছে নারী-শ্রম।[৩৪]

ইটালি ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন রাশিয়া সফর করে এসে লেখেন ঃ

> আমরা রাশিয়ায় কনকনে শীতের মধ্যে মেয়ে শ্রমিকদিগকে ইটের বোঝা বয়ে বয়ে ষষ্ঠ তলাও পেঁছিতে দেখেছি। এইসব কাজের জন্য অন্যান্য দেশে যে রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাদের জন্যে সে সব কিছুই ছিল না।[৩৫]

---

৩২. ইশ্‌তিরাকিয়াৎ রুশ কী তজরবা গাহ মে—কৃত আসগর আলী আবেদী।

৩৩. প্রাভিদা ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সন।

৩৪. সোভিয়েট ইকনমিক পাওয়ার।

৩৫. সোভিয়েট ওয়ার্ল্ড, মাসিক চেরাগেরাহ, সোশ্যালিজম নম্বর —করাচী।

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে শ্রমই একমাত্র উৎপাদন-উপাদান। শ্রম যার নেই উৎপাদনে তার কোন অংশও নেই। আর এই মনোবৃত্তির ফলে তাঁরা এমন পর্যায়ে নেমে আসে যে, বালকদের পর্যন্ত তার কাজ থেকে রেহাই দেয় নি। উৎপাদন বৃদ্ধির লিপ্সায় এদেরকেও কঠোর শ্রমে তারা নিযুক্ত করে। এমন কি বার থেকে চৌদ্দ বছরের কিশোরদেরও বার হতে ষোল ঘণ্টা ক্ষেতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বার বছরের বালকেরা উপর্যুপরি তিন দিন কাজ করার পর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে থুবড়ে পড়ে যায়। তবুও এই নির্মমদের প্রাণ এতটুকুও টলে নি।৩৬

মনোমত কোন পেশা গ্রহণ করার মত মানবীয় অধিকার হতেও তথাকার শ্রমিকগণ বঞ্চিত। মজদুর নিরাপত্তা স্কুলগুলিতে ১৮১৯ বছরের যুবকদেরকে ট্রেনিং নিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু পেশা গ্রহণের ব্যাপারে তাদের মর্জির কোন পরওয়াই করা হয় না। অনেক সময় নির্ধারিত কোটা পূরণ না হলে আইনের শাসন কায়েম করে জোর করে শ্রমিকদের নিযুক্ত করা হয়। খনি ও ভারী শিল্প কারখানাগুলিতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী বাধ্যতামূলক শ্রম বিনিয়োগ করা হয়। হাজারো প্রচারণা চালিয়েও সোভিয়েট সরকার এদিকে তেমন উৎসাহ যোগাতে সক্ষম হয় নি। মস্কো থেকে প্রকাশিত 'বলশেভিক' পত্রিকায় ১৯৪৭ সনের এক রিপোর্টে বলা হয়, "ঐ জাতীয় ট্রেনিং স্কুলগুলিতে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ যুবকদের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং গত বছর যারা শরীক হয়েছে তাদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি হয়েছে। প্রশ্ন হলো বাকী দুই-তৃতীয়াংশ কি করে পূরণ করা হয়েছিল ?

ঠিক এমনিভাবে ইজভেস্তিয়ার ১৯৪৮ সনের এক রিপোর্টে জানা যায়, "কারখানার জন্য ট্রেনিং স্কুলগুলিতে ক্রিমিয়ায় চার হাজার তিনশ একাশি জন নিজের খুশীতে যোগদান করেছে।" উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সংখ্যা নির্ধারিত কোটার মাত্র শতকরা চার ভাগ। আর বাদবাকী নিশ্চয়ই জবরদস্তি করে পূরণ করা হয়।

এরই আলোচনা করতে যেয়ে যুগোশ্লাভিয়ার প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক

৩৬. প্রাভদা, মাসিক চেরাগেরাহ, সোশ্যালিজম নম্বর—করাচী।

www.pathagar.com

নেতা মিলাভন জিলাস বলেনঃ

> সমাজতন্ত্রীদের নীতি হল কৃষক ও শ্রমিকদেরকে চুষে খাওয়া। এরই প্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক শ্রম সমাজতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়ে পড়েছে।[৩৭]

আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকদের চেতনাহীন যন্ত্রের মতই ব্যবহার করা হচ্ছে। যন্ত্রের যেমন স্বাধীন আশা-আকাঙ্ক্ষা কিছুই নেই তেমনি শ্রমিকদের সব কিছুই কমুনিজমের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে।

তাই আমরা দেখি, আপন পসন্দানুযায়ী কোন স্থান নির্বাচন বা অধিকতর সুবিধাজনক পরিবেশে গমনের অধিকার কোন শ্রমিকের নেই; বরং নিয়ন্ত্রণযন্ত্রীরা যেখানেই তাকে পাঠায় সেখানেই যেতে সে বাধ্য।

একবার স্টিল ইন্‌স্টিটিউটের কোর্স সম্পন্নকারিণী এক মেয়ে সার্ভিস কমিশনে দরখাস্ত করে পাঠায় যাতে মস্কো থেকে তাকে অন্য কোথাও বদলি করা না হয়। কিন্তু ঐ দরখাস্তের জওয়াবে কমিশনের জনৈক সদস্য তাকে বলেন, "কমরেড! তোমাকে ঐ জায়গায়ই যেতে হবে যেখানে আমরা তোমাকে পাঠাব।"[৩৮]

এ যে একজন মানুষের উপর কতটুকু অন্যায় জবরদস্তি, তার স্বাধীনতার উপর নির্মম হস্তক্ষেপ তা বলা বাহুল্য। ১৯৪০ সনের এক সোভিয়েট সরকারী ঘোষণায় বলা হয়ঃ

> মাসিক বা দৈনিক যে কোন মহিলা কাজ করুক না কেন কোন মজুরের স্বাধীনভাবে স্থানান্তর গমন পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ করা হল। স্থানন্তর গমনের অনুমতি দেওয়ার অধিকার একমাত্র কারখানা ডিরেক্টরেরই রয়েছে।[৩৯]

পরে ক্রুশ্চেভের আমলে ১৯৫৬ সনের জুনে ঐ নির্দেশ বাতিল করা হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হয় তার চাকুরীর মেয়াদে পূর্ব সময় গণনা করা হবে না। অর্থাৎ কোন কারখানায় দশ বছর মেহনত করার পরও যদি কোন মজুর সেই কারখানা ছেড়ে আসে তবে তার পেনশনের বেলায় উক্ত সময় সামিল করা হবে না এবং নতুন চাকুরি নেওয়ার ছয় মাস পর্যন্ত সে সোশ্যাল ইন্‌স্যুরেন্সের অধিকারী হতে পারবে না। ১৯৫৭

---

৩৭. 'দি নিউ ক্লাস—কৃত মিলাভন জিলাস।

৩৮. প্রাভদা, ইশ্‌তিরাকিয়াৎ রুশ কি তজরবা গাহে মে—কৃত আসগর আলী আবেদী

৩৯. ইশ্‌তিরাকিয়াৎ রুশ কি তজরবা গাহে মে—কৃত আসগর আলী আবেদী।

www.pathagar.com

সনেও উক্ত আইনে কিছুটা সংশোধনী আনা হয় কিন্তু এর পরও এমন কতকগুলি জটিলতার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যার কারণে শ্রমিকরা তাদের এই সুবিধা ভোগ করতে পারে না। এখনও পূর্বের পরিস্থিতিই বিদ্যমান। এই সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে মিঃ ক্যাম্পবেল বলেন ঃ

> সোভিয়েট রাশিয়ার মজুর পলিসিতে অন্যায়, জবরদস্তি ও চাপ প্রয়োগ এক স্বতন্ত্র স্থান রাখে। সকল মজুরকেই এক একটি করে পরিচিতি কার্ড রাখতে হয়। এতে তাঁর নাম, পেশা, মজুরি প্রভৃতি লেখা থাকে। যে কারখানায় সে কাজ করে, তার ম্যানেজারের কাছে তা তা'কে দিয়ে দিতে হয়। যত দিন সে ঐ কারখানায় থাকে ততদিন কার্ডখানা ঐ ম্যানেজারের কাছেই থাকে। নতুন কোন কারখানায় চলে গেলে তা আবার আগের কারখানা ম্যানেজারের কাছ থেকে নিয়ে নতুন কারখানার ম্যানেজারের কাছে দিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ এর ফলে কোন শ্রমিকই তার পূর্বতন ম্যানেজারের মর্জি ব্যতিরেকে নতুন কোন চাকুরি নিতে পারে না। তাই এতদিন পর চাকুরি বদলের যে স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা নিতান্ত হাস্যাস্পদ এবং সীমিত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও একটু দেরী করে এলে অথবা পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকলে বিভিন্ন রকমের কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। আসতে মাত্র বিশ মিনিট দেরী হয়ে গেলে দুই থেকে চার মাসের বা বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটানো কিংবা বেতনের শতকরা পঁচিশ ভাগ কেটে নেওয়া হয়।[৪০]

এই সমস্ত অত্যাচারের মুখে মজুররা কিছুই করতে পারে না। একটা জন্তুর মত তাদেরকে সব কিছুই সহ্য করে নিতে হয়। ১৯৬৮ সনের এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, "হরতাল করলে পনর বছরের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।"[৪১]

সামান্য সামান্য অপরাধের জন্য শ্রমিকদের নির্মম শাস্তি প্রদান করা হয়

১৯৪১ সনের এক সোভিয়েট সরকারী নির্দেশনামায় জানা যায় যে, ফৌজী সাপ্লাইয়ে নিয়োজিত কোন কর্মচারী অথবা মজুর যদি কাজ

৪০. **Campbell Soviet Kizai Naymon, translated in to Japanese by Mr, Ishizawa.**

৪১. প্রাভদা, ২৬ শে ডিসেম্বর, সংখ্যা, ১৯৬৮।

www.pathagar.com

ছেড়ে দেয় বা কাজ করতে অস্বীকার করে তবে তাকে, পাঁচ বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত কঠিন শাস্তি দানের বিধান রয়েছে। কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে চাকুরি পরিবর্তন করলে দু' মাস থেকে ছ'মাস পর্যন্ত তাকে জেলের ভোগান্তি সহ্য করতে হয়। এমনিভাবে রেলে এবং ওয়াটার সাপ্লাইয়ে নিয়োজিত মজুরদের দায়িত্ব লাল ফৌজের মতই গণ্য করা হয়। অর্থাৎ সৈন্যদের যে রকমের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে তেমনিভাবে ঐ সমস্ত শ্রমিকদের শাস্তি দেওয়ার বিধান করা হয়েছে।[৪২]

এই সমস্ত জুলুমের প্রতিকার তারা আদালত হতেও নিজেদের কোন সমর্থন পায় না। সেখানকার আদালতের অর্থই হল, কম্যুনিস্ট কর্মকর্তাদের যাতে সুবিধা হয়—এর নিশ্চয়তা বিধান করা। সর্বহারাদের কাতর আর্তনাদের আদালত ভবনের ভিত নড়ে উঠলেও ঐ ন্যায়দণ্ডের (!) কর্তাদের দিল এতটুকুও কেঁপে ওঠে না, প্রখ্যাত বামপন্থী রুশীয় আইনবিদ মিঃ ভাইসিনস্কী সোভিয়েট রাশিয়ার আইনের মূল প্রতিপাদ্যের দিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে বলেন ঃ

> আমাদের আদালত যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন তার মূল দৃষ্টিভঙ্গির সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কোন প্রচ্ছন্ন মাপকাঠি থাকে না; বরং এর বুনিয়াদী লক্ষ্য হল, সাধারণ্যে সোভিয়েট সরকারী আইন বা কার্যক্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা।[৪৩]
>
> ন্যায়ের নয় জুলুম প্রতিষ্ঠার এ এক হাতিয়ার মাত্র। সোভিয়েট আদালত সরকারী কার্যক্রমের সামনে অবোধ শিশুর মতই অসহায়। 'ন্যায়ের বাণী সেখানে নীরবে কাঁদে'।

শাস্তির নির্মমতা চিন্তা করে কেউ কিছু বলতে পারে না। ভিতরে ভিতরে অসহনীয় জ্বালায় ধুঁকে ধুঁকে মরে। 'ভিক্টর ক্রবিচেস্‌কো' তার এক বন্ধুর কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন—"নির্ধারিত চুক্তিতে দস্তখত করার জন্য তার উপর চরম বর্বরতা প্রদর্শন করা হয়।"

তার বন্ধুর ভাষায় ঃ

'আমাকে ধরে আনা হয় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তীব্র ভোলটিজের বাল্‌বের দিকে পলকহীন নেত্রে চেয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। আলোর

৪২. ইশতিরাকিয়াৎ রুশ কী তজরবা গাহ মে—কৃত আসগর তালী আবেদী।

৪৩. 'ল' অব দি ইউ-এস-এস-আর।

www.pathagar.com

তীব্রতায় আমার চোখগুলি জ্বলে গলে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখের পানি ফেললে লাথি ঘুষির বৃষ্টি বর্ষণ করে আমাকে তার জওয়াব দেওয়া হত। আর এমনিভাবে বাহাত্তরটি ঘন্টা আমার উপর দিয়ে কেটে যায়।"

তিনি আরো বলেন ঃ

> অনেক সময় লবণাক্ত খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং পর পর কয়েকদিন পর্যন্ত পিপাসার্ত রাখা হত। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও এক বিন্দু পানি পাওয়া যেত না। পিপাসা আরও উসকিয়ে দেওয়ার জন্য দেখিয়ে দেখিয়ে পানি পান করা হত। এরপর হাত-পা বেঁধে উল্টো করে চল্লিশ ঘন্টা লটকে রাখা হত। শরীরের লোমগুলো একটা একটা করে এমন নিষ্ঠুরভাবে চিমটে তুলে নেওয়া হয় যাতে চামড়া পর্যন্ত উঠে যায়।

মিঃ ভিক্টর বলেন—"তাকে আমি বললাম—এই অসহ্যকর কাহিনী বন্ধ করে দিন।"

তিনি বললেন ঃ

> এখনও আপনি এর পরম অমানুষিকতার কথা শুনেন নি। আমার স্ত্রী ছাড়া আজ পর্যন্ত কাউকে তা জানাই নি। —একদিন এই কসাইরা আমাকে একদম উলঙ্গ করে শরীরে, বুকে, পিঠে বেদম-ভাবে প্রহার করতে থাকে। এর পর মেঝেয় চিৎকরে শুইয়ে দিয়ে দু'জন আমাকে ধরে রাখে; আর তৃতীয় এক ব্যক্তি আমার উরুদেশে এবং অন্যান্য স্থানে সামনে কোড়ার পর কোড়া মারতে থাকে। আমার যে কি কষ্ট হচ্ছিল তা কেউই আন্দাজ করতে পারবে না। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না—বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। কয়েকদিন পর হুঁশ এলে আমাকে হাসপাতালে দেখতে পেলাম।
>
> এমনিভাবে তারা আমার কাছ থেকে যা চেয়েছিল তা আদায় করে নিল। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দাম্পত্য জীবন চালানোর আমার আর কোন যোগ্যতা রইল না।[৪৪]

কোন শ্রমিক যদি ঠিকমত বাড়ী না ফিরে তবে তার স্ত্রী বুঝতে পারে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তখন সে তার খাবার পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দেয়। খাবার ফেরত এলে সে বুঝতে পারে, তার প্রিয়তম স্বামী লেনিনের উদ্দেশ্যে বলি হয়ে গেছে।

---

৪৪. ইশ্‌তিরাকিয়াৎ রুশ কী তজরবা গাহ মে—কৃত আসগর আলী আবেদী।

www.pathagar.com

রাশিয়ার শ্রমিক তথা সর্বহারাদের অসহায়ত্বের কথা বলতে যেয়ে লাল চীনের সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বলেন ঃ

> আজ সেখানে মানুষের উপর অত্যাচারী জারের আমল হতেও নির্মম, অমানুষিক নির্যাতন চালান হচ্ছে।[৪৫]

আর চীন ! মাও সেতুং সমস্ত দেশটাকে একটি বৃহৎ কারাগারে পরিণত করেছেন—মানুষের মানবিকতার যেখানে কোন মূল্যই নেই।

পিকিং-এর নেতাদের এই সব মুখরোচক বুলি যে, তারা প্রলেতারিয়েতদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে—প্রচারণা বৈ কিছুই নয়। চেয়ারম্যান মাও এবং তার তল্পীবাহকদের নীতি শ্রমিক সমাজের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।[৪৬]

জুলুম কোন কালেই বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। মানবতা বিরুদ্ধ সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। কিছুদিন পরই মানুষ হন্যে হয়ে ওঠে এ থেকে বাঁচার জন্যে।

তাই আমরা দেখি, পূর্ব বার্লিন, পোলান্ড, হাঙ্গেরীর সর্বহারা সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচার দাবীতে বিক্ষোভ করে ওঠে—সমাজতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে দারুণ রোষে ফেটে পড়ে। কিন্তু নির্দয়ভাবে এদেরকে দমন করা হয়।

ধনবাদী দেশগুলিতে যেমন শ্রমিকরা বাঁচার দাবি জানালে, এতে কম্যুনিস্ট চরের হস্ত আবিষ্কার করে তা দমন করা হয়, ঠিক তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ যদি নিজেদের বাঁচার দাবি নিয়ে ওঠে, তবে এতে আবিষ্কার করা হয় সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। আর এমনি ধরনের ভুয়া অজুহাত এনে হাজারো মানুষের আর্ত-কণ্ঠের দাবী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণ সহ্য করতে পারে নি সে জুলুম। রাশিয়ার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য স্বাধীনতার দাবিতে তারা সংগ্রামে মুখর হয়ে ওঠে ১৯৬৮ এর আগস্ট। কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা স্পৃহার জওয়াব দেওয়া হল লাল ফৌজের ট্যাংক ও কামানের আঘাতে। বহু তাজা রক্ত পিচ্ছিল করে দেয় চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজপথ। মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক ছাত্র-জনতা নিজের গায়ে পেট্রোল ধরিয়ে জানায় এ নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিবাদ।

---

৪৫. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই জুন, ১৯৬৯ সন।

৪৬. রাশিয়ার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান—১৯৬৯।

www.pathagar.com

মাও ও কম্যুনিস্টদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে চীনের শ্রমিক জনতার উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলে কম্যুনিস্ট কর্মকর্তারা আতংকিত হয়ে ওঠে—আর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে তাদের উপর হিংস্র 'হায়েনার' মত লেলিয়ে দেওয়া হয় রেডগার্ডদেরকে। সর্বহারা জনতার এ ধূমায়িত আগুন এমনভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল যে, দীর্ঘ তিন-চারটি বছর ধরে তাদেরকে নির্মমভাবে যবাই করে নিস্পন্দ করে দেওয়া হয় শ্রমিক জনতার মুক্তি আন্দোলন।

কেন এমন হল? হাজারো মজলুমানের রক্তের ভিতের উপর, লাখোজনের রঙীন আশার স্বপ্ন নিয়ে, একদিন যে সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল তার পরিণতি মানুষের জন্য এমন চরম অস্বস্তিকর কেন হয়ে দাঁড়াল?

মেহনতি জনতার মুক্তির মহৎ ইচ্ছা নিয়ে যে সংগ্রামের আরম্ভ—তা আজ এভাবে মেহনতি জনতারই কেন টুটি টিপে ধরল?

এর জওয়াবে বলতে চাই বস্তুবাদের আবহমানকালের ধারা এ-ই। বস্তুতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা মানুষকে কোনদিন স্বাচ্ছন্দ্যের, সুখের, শান্তির দরওয়াজায় টেনে নিয়ে আসতে পারে নি। সব সময়ই এর পরিণতি মারাত্মক শোষণের আকারে মানবতার সামনে মুখ ব্যাদান করে এসে দাঁড়িয়েছে।

গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার শ্লোগান নিয়ে একদিন যে বস্তুবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল, তার ফলশ্রুতি আজ আমাদের সামনে ধনী-দরিদ্রের এক পাহাড়-প্রমাণ বৈষম্যের রূপ নিয়ে বিদ্যমান—যেখানে ধনী হয় আরও ধনী, আর গরীব ক্লেদাক্ত সরীসৃপের কিলবিলে বাচ্চা-গুলির মত পাঁকে ডুবে মরে।

সমাজতন্ত্র বা মার্কসিজম বস্তুতান্ত্রিকতারই চরম বিবর্তিত রূপ। লেনিনের কথায়—'বস্তুসর্বস্বতার আর এক নামই কম্যুনিজম।' তাই এ ধনতন্ত্রের চেয়েও মারাত্মক মূর্তি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ বস্তু-বাদিতার অবশ্যম্ভাবী বিকার এই। বস্তু শোষণ ছাড়া আর কিছুই জানে না। এ মানবতাকে মানুষকে শুধু চুষে চুষে খতম করতেই জানে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তথা পাশ্চাত্য সামাজিকতা অনেকদিন থেকেই সত্য-সঠিক খোদায়ী শিক্ষার আলোক হতে বঞ্চিত। বাইবেলের মধ্যে যা-ও কিছুটা পেয়েছিল, তা-ও অসম্পূর্ণ এবং য়াহুদী ষড়যন্ত্রের

www.pathagar.com

শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর অন্ধ একটা জাতক্রোধের কারণে 'কুরআনী' আলোকবর্তিকাও তারা হাতে তুলে নেয় নি। তাই ইউরোপীয় দার্শনিকরা নিজেদের সমস্যা সমাধানের কোন সুসংহত দিগ-দর্শন না পেয়ে, নিজেদের দুর্বল ও ভ্রান্ত মস্তিষ্কের আলোকে সব কিছু চিন্তা করার ব্যাধিতে তারা ভুগছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা দেখে মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ দার্শনিক হয়ত সদিচ্ছা নিয়েই এদের মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বস্তুর অন্তর্নিহিত সংঘাতটির সম্যক উপলব্ধি তাঁদের ছিল না। তাই ভাল করতে চেয়েও, এরই ফলশ্রুতিতে আজ পৃথিবীতে এক অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে পড়েছে।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

> কোন এক ক্রীতদাসের মালিক নিজে ময়দার তৈরী ভাল খানা খেত; কিন্তু একে নিকৃষ্ট মানের আটা খাওয়াত। উক্ত ক্রীতদাসটির এই অবস্থা ভাল লাগে নি। সে তাকে বেচে দিতে মালিককে অনুরোধ জানাল, যাতে সে অধিকতর সহৃদয় ব্যক্তির অধীনস্থ হয়ে থাকতে পারে। মালিক তাকে বেচে দিল; কিন্তু এবার যে কিনে নিল সে নিজে খেত আটা আর তাকে খাওয়াত ভুষি। আবার সে তাকে বেচে দেওয়ার অনুরোধ জানালে এই মালিকও তাকে বিক্রি করে দিল। তখন এমন একজন তাকে খরিদ করে নেয় যে নিজেই খেত ভুষি; আর তাকে কিছুই খেতে দিত না। ক্রীতদাসটি পুনরায় তাকে বিক্রি করে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। বর্তমান মালিকও তাকে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু এবার তাকে যে কিনে নিল, সে নিজেই কিছু আহার করত না; অধিকন্তু এই মালিকটি তার মাথা কামিয়ে ফেলে এবং রাত্রে তাকে ঠায় বসিয়ে রেখে বাতি-দানের পরিবর্তে তার মুন্ডিত মাথাকেই বাতি রাখার স্থান হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে।

একবার এক দাস ব্যবসায়ী তাকে জিজ্ঞেস করলঃ

> এখনো কেন তুমি এর মালিকানা সহ্য করে আছ? সে জওয়াবে বলল—আমার ভয় হয়, এবার আমাকে যে কিনে নেবে সে হয়ত বাতির পরিবর্তে আমার চোখেই সলতে জ্বালিয়ে ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে।"[৪৭]

---

৪৭. নফ্‌হ্‌ তুল আরব—কৃত মাওলানা এজাজ আলী মরহুম।

www.pathagar.com

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থা এ-ই। সর্বহারা মানুষ আজ পুঁজিবাদী নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে এ থেকে বাঁচবার আশায় আজ বস্তুবাদেরই আর এক সন্তান সমাজতন্ত্র তথা স্বৈরতন্ত্রের খপ্পরে এসে পড়েছে। এ থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায়ই আর তাদের নজরে আসছে না।

মার্কস জানতেন না যে, ভবিষ্যতে তারই নাম নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ সর্বহারা সাধারণ মানুষকে জোঁকের মত চুষে খাবে, তিল তিল করে যবাই করবে।

আনুষঙ্গিক কয়েকটি সূত্রের মাধ্যমে—পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় যেগুলির জন্ম—একটি কল্পিত সিদ্ধান্তে তিনি এসে পৌঁছেছিলেন—যাতে বাস্তবতার লেশ মাত্র ছিল না। তিনি শুধু জানতেন দু'য়ে-দু'য়ে চার হয়; কিন্তু অনেক সময় বাইশও যে হয়, এ তার ধারণার বাইরেই ছিল।

আর লেনিন মার্কসের প্রতিপাদ্যগুলির স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী একান্ত একগুঁয়েমীর সাথে এইগুলি কার্যকরী করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান।

পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহ্ পাকের বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এক জীবন বিধান। আল্লাহ্ পাক নিজে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর একমাত্র তিনিই জানেন মানুষের অন্তর্নিহিত দোষ-গুণের খবর। মানুষ কি করে সুষ্ঠু ও সংহত, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন চালাবে এর সম্যক উপলব্ধি আছে তাঁর-ই।

তাই তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে মা'সুম আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমে মানুষের জন্য বিধান পাঠিয়েছেন জীবন চালাবার—আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে সমৃদ্ধির পথে চলবার—এর নামই ইসলাম—আর এরই পূর্ণতা ঘটে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবনাদর্শে।

আল্লাহ্র প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও নবী প্রদর্শিত আদর্শের অনুসরণে ইসলাম চায় এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করতে, শ্রমিক ও নিয়োগ-কর্তার সৌহার্দমূলক পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, এমন এক বিধান প্রচলন করতে—যেখানে শোষণ নেই, অত্যাচার নেই, নিপীড়ন নেই। সর্বোপরি নেই দুর্বলকে পিষে খতম করার কোন জঘন্য প্রবণতা। যেখানে মজুর মালিকের সংঘাত নেই—সকলেই মর্যাদার একই সমতলে আসীন, একই প্রবাহে যেখানে কলচ্ছন্দে বয়ে চলে সকলের জীবন ধারা।

www.pathagar.com

থাকে না যেখানে শ্রেণী-সংগ্রামের তিক্ত ফল আর মানবতা-বিরোধী শ্বাসরুদ্ধকর কোন পরিস্থিতি। আকাশ যেখানে ভারাক্রান্ত হয় না সর্বহারাদের কাতর আর্তনাদে। বিমুক্ত স্বাধীনতার অনাবিল আনন্দে বয়ে যায় জীবনপ্রবাহ। চোখ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক নতুন সূর্যের ইঙ্গিতে।

www.pathagar.com

তৃতীয় এক আলোকোজ্জ্বল পথ

ইসলাম

যা সকল সমস্যার সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ সমাধান
দেয় এবং এর নিশ্চয়তা বিধান করে

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে 'শ্রম'

শ্রমিকের আলোচনা করতে যেয়ে শ্রমিকের কথা আপনা-আপনি এসে পড়ে। শ্রমিকদের হাতে পুঁজি বিনিয়োগের কোন উপায় না থাকায় এবং নিজেদেরকে গতর খেটে পেট চালাতে হয় ভেবে তাদের মানসিক কাঠামো স্বভাবতই দুর্বল থাকে। এক লজ্জাজনক অনুভূতির শিকার হয়ে পড়ে তারা।

ইসলাম শ্রমিকদেরকে এই হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সোচ্চার হয়ে ঘোষণা করেছে—ওরে! তুই ছোট নস্। পুঁজি না থাকলেও তোর কাছে শ্রমের যোগ্যতা নামক সর্বশ্রেষ্ঠ পুঁজি মওজুদ রয়েছে। আর তাতে নেই কোন অসমতা। গতর খেটে উপার্জন করা ইসলামের দৃষ্টিতে কোন লজ্জাজনক কাজ নয়। হালাল রুজী তালাশ করা তা যে ভাবেই হোক অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ—দ্বিতীয় স্তরের ফরয।

নবী-এ-করীম ইরশাদ ফরমান—শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।[৪৮]

একবার রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হল—ইয়া রসূল! কোন্ ধরনের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? তিনি উত্তর করলেন—নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।[৪৯]

রসূলে পাক আরো ফরমান—যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আঃ) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা চালাতেন।[৫০]

আমরা জানি, নবী—যিনি আল্লাহ্ প্রেরিত এবং মানবতার দীক্ষাগুরু হয়ে আসেন তিনি কখনও নীচ কাজ করতে পারেন না। উপার্জন করা, পরিজনদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পরিশ্রম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের মতই। ঈমানের ঝান্ডা নিয়ে মাঠে-ময়দানে ব্যাকুল

৪৮. আহমদ, মাজ্‌মাউজ্‌জাওয়ায়ীদ চতুর্থ খন্ড—লিল্ হায়সামী।
৪৯. আহমদ, তাবরানী মাজ্‌মাউজ্‌জাওয়ায়ীদ, চতুর্থ খন্ড—লিল্ হায়সামী।
৫০. বুখারী, মিশকাত।

www.pathagar.com

প্রতীক্ষায় ঘুরে বেড়ানোর মর্যাদায় এ অভিষিক্ত। রসূলে করীম এক সাহাবীর প্রশ্নের জওয়াবে এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন—নিজের পরিজনদের নিমিত্ত হালাল রুজী উপার্জনে ব্যাপৃত থাক; কেননা এ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করার মতই।"[৫১]

একজন শান্ত সৎকর্মী শ্রমিক যখন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসে তখন আল্লাহ্ তার প্রতি এমন সন্তুষ্ট হন যে, তার গুনার খাতা তিনি মাফ করে দেন। এই প্রেক্ষিতে নবী করীম (স.) ফরমান—যে ব্যক্তি শ্রমজনিত কারণে ক্লান্ত সন্ধ্যা যাপন করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।"[৫২]

একজন মুমিনের কাছে এর চেয়েও আবেদনময় বাণী আর কি হতে পারে?

উপার্জনের দিকে প্রোৎসাহিত করতে যেয়ে আল্লাহ্‌পাক ইরশাদ করেন—"যখন নামায তোমাদের শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা (আল্লাহ্‌র) যমীনে ছড়িয়ে পড়; আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশে ব্যাপৃত হয়ে যাও।"[৫৩]

ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে শ্রমের দিকে, সৎ উপার্জনের দিকে উৎসাহিত করেছে; একে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে ঠিক তেমনি কোন রকমের উপার্জন না করে সমাজের গলগ্রহ হয়ে থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক কাজ। বেকার থাকা ইসলাম কোনক্রমেই সহ্য করতে পারে না। ইসলামী শরীয়তের প্রখ্যাত ভাষ্যকার সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,—কাউকে বেকার বসে থাকতে দেখলে আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য লাগে—জাগতিক কোন কাজও করে না, অন্যদিকে পরকালীন সফলতার জন্য থাকে নিশ্চেষ্ট।

কোন রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী করীম (স.) এত বেশী ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষা করবে না তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম।"[৫৫]

---

৫১. তীবরানী, মাজ্‌মাউজ্‌জাওয়ায়ীদ, চতুর্থ খন্ড—লিল্ হায়সামী।
৫২. তীবরানী, মাজ্‌মাউজ্‌জাওয়ায়ীদ, চতুর্থ খন্ড—লিল্ হায়সামী।
৫৩. ফা ইযা কাযাইতাস সালাতা ফান্‌তাশির ফিল আরদি ওয়াবতাগূ মিন ফাদলিল্লাহি।
৫৪. তীবরানী মাজ্‌মাউজ্‌জাওয়ায়ীদ, চতুর্থ খন্ড—লিল্ হায়সামী।
৫৫. আবূ দাউদ, রিয়াজুস সালিহীন—লিন নাওয়াবী।

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন, "যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এ রকম অবস্থায় মুলাকাত করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও থাকবে না।[৫৬]

অর্থাৎ দুনিয়াতে সে আত্মমর্যাদাকে বিকিয়ে দিয়ে নিজেকে অপমানিত করেছে। তাই এর শাস্তিস্বরূপ কিয়ামতের দিন তার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে।

নবী করীম (স.) ভিক্ষালব্ধ খাদ্যকে অগ্নিদগ্ধ পাথর বলে অভিহিত করেছেন।[৫৭]

অনেক সময় কোন কার্যক্ষম ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখলে তিনি নিজে তাকে এর হীনতা বুঝাতেন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার কর্ম-সংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিতেন।

একবার এক সুস্থ সবল ব্যক্তি তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে আসে। তখন তিনি তাকে বললেনঃ কেন ভিক্ষা করে বেড়াও, তোমার কি কিছুই নেই? লোকটি বলেঃ একটি পানি খাওয়ার লোটা এবং গায়ে দেওয়ার জন্যে একখানা কম্বল আছে।

নবী করীম (স.) তাকে তাই নিয়ে আসতে বললেন। পরে নিজেই নিলাম ডেকে দুই দিরহামের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দিলেন। এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে এনে নিজেই এর হাতল লাগিয়ে দিয়ে তাকে বললেন—'যাও, জঙ্গলে যেয়ে কাঠ কেটে জীবিকা চালাও। পনর দিনের ভিতর যেন তোমাকে দেখতে না পাই'।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল উক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হয়েছে। একদিন সুন্দর কাপড় পরে কিছু হাদিয়া নিয়ে এসে দরবারে নববীতে তিনি হাযির হলেন। তখন নবী করীম (স.) তাকে বলেছিলেনঃ অপরের সামনে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হওয়ার চেয়ে এই ত তোমার জন্য উত্তম পথ।[৫৮]

নবী করীম (স.) শ্রমের মূল্যায়ন করতে যেয়ে অনেক সময়ই বলতেনঃ তোমাদের কেউ দড়ি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে, লাকড়ি জমা করে পিঠে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করবে এবং এমনিভাবে আল্লাহ্‌

৫৬. বুখারী, মুসলিম, রিয়াজুস্‌সালিহীন—লিন্‌ নাওয়াবী।
৫৭. মুসলিম, রিয়াজুস্‌সালিহীন—লিন্‌ নাওয়াবী।
৫৮. আবু দাউদ, তিরমিযী।

www.pathagar.com

তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন, দোরে দোরে ভিক্ষা, করুণা ও লাঞ্ছনা পাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভাল।[৫৯]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইত্যাকার উপদেশ এবং শ্রমের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলি সাহাবা-ই-কিরামের জীবনে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, তারা নীচু হতে নীচু কাজকেও কোনদিন ঘৃণার চোখে দেখেন নি।

প্রখ্যাত সিপাহসালার, ইরান বিজেতা হযরত সা'দ ইবনে আবী-ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে রিওয়ায়েত আছে যে, তিনি ক্ষেতে খাদ উঠিয়ে উঠিয়ে এনে দিচ্ছিলেন, আর বলছিলেন—এক টুক্‌রি খাদ আর এক টুক্‌রি গম।[৬০]

অন্য এক সাহাবী হযরত হাকীম-ইবনে-হাযম (রাঃ) বলেন, 'আমি একবার রসূলে পাকের কাছে গেলাম এবং কিছু চাইলাম। নবী করীম (স.) তা দিয়ে দিলেন। আবার চাইলাম, তখনও তিনি দিয়ে দিলেন। পুনরায় চাইলে তখনও দিলেন এবং বললেন ঃ

> দুনিয়ার এই সম্পদ দেখতে খুব মনোমুগ্ধকর। যে ব্যক্তি নিরাসক্ত মন নিয়ে লাভ করে তার সম্পদে বরকত হয়; আর যে লালসার মন নিয়ে তা হাসিল করে তার মালে বরকত হয় না। এমন হয়ে যায় যে, খায় তবু পেট ভরে না।

নবী করীম (স.) ভিক্ষাবৃত্তির নিকৃষ্টতার উপর জোর দিতে গিয়ে তাকে আরও বললেন ঃ

হাকীম! জেনে রাখ, দাতার হাত প্রার্থীর হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হযরত হাকীমের মন অনুশোচনায় ভরে উঠল। নবীর কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি বললেন ঃ "ইয়া নবী আল্লাহ্‌! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্তও আর কাউকে কষ্ট দেব না।"

ঠিক তা-ই হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর তাকে কিছু দিতে চাইলেন কিন্তু তিনি নেন নি। এরপর হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের আমলেও তাঁকে কিছু দিতে চাওয়া হলে বিনয়ের সঙ্গে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন উমর (রাঃ) বলেছিলেন ঃ

> মুসলমানগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, হাকীমকে মালে 'ফাই' হতে তার প্রাপ্য অংশ দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি তা' নিজেই নেন নি।

---

৫৯. বুখারী, রিয়াজুস্‌ সালিহীন—লিন্‌ নাওয়াবী।

৬০. বায়হাকী, দ্বিতীয় খণ্ড।

www.pathagar.com

হযরত হাকীম (রাঃ) মওত-তক কারো কাছে আর কোন দিন কিছুই চান নি।"[৬১]

হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ

> আমরা সাত থেকে নয়জনের এক জামাত নবী করীমের কাছে গেলাম। তিনি ইরশাদ করলেন—তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে চাও না?

বেশীদিন হয়নি তাঁরা হুযুরের হাতে বায়'আত করেছিলেন। তাই তাঁরা বললেন—ইয়া নবী আল্লাহ্‌। আমরা তা বায়'আত করেছি।

নবী করীম (স.) আবার বললেনঃ তোমরা আল্লাহ্‌র রসূলের হাতে বায়'আত করতে চাও না?

আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম, বললাম—কিসের উপর আমরা বায়'আত করব? নবী করীম (স.) বললেন—আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, আনুগত্য প্রদর্শন করবে আর আমীরের কথা শুনবে।

এরপর নবী করীম (স.) আমাদের দিকে আরও ঝুঁকে এলেন, ধীর কণ্ঠে বললেন, "আর কারও কাছে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে না। নবী করীমের এই কথার এতদূর প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল যে, হযরত আউফ বলেন—এদের কারও হাত থেকে যদি চাবুকও পড়ে যেত তবে তা'ও তারা নিজের হাতেই তুলে নিতেন—উঠিয়ে দিতে কারও সাহায্য মাগতেন না।"[৬২]

আজও আমরা ইতিহাসের পাতায় জ্বল জ্বল করতে দেখতে পাই—প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) পেটের ক্ষিধায় অস্থির হয়ে মসজিদে নববীতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতেন; আর অন্যেরা পাগল মনে করে, তার ঘাড়ে পা দিয়ে ধরত তবুও কোন দিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বের হন নি।"[৬৩]

হযরত আলী (রাঃ) মজদুরীর তালাশে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন আর রাত পর্যন্ত কোন য়াহুদীর ক্ষেতে মেহনত করে কিছু খাবার নিয়ে ঘরে ফিরে আসতেন। কিন্তু ভিক্ষার হাত দরাজ করেন নি কোন দিকে।

---

৬১. বুখারী, মুসলিম, রিয়াজুস সালিহীন—লিন্‌ নাওয়াবী।
৬২. মুসলিম, রিয়াজুস্‌ সালিহীন—লিন্‌ নাওয়াবী।
৬৩. বুখারী।
৬৪. আহমদ, মাজ্‌মাউজ্‌জাওয়ায়িদ, চতুর্থ খণ্ড—লিল্‌ হায়সামী।

www.pathagar.com

নবী-দুলালী ফাতিমা (রাঃ)-এর পানি বইতে বইতে বুকে-পিঠে দাগ পড়ে যেত, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে হাতে ফোস্‌কা পড়ে যেত, তবুও শ্রমবিমুখ হন নি। হযরত আলী (রাঃ) একদিন উপস্থিত লোকদেরকে বলেছিলেন, "আমি কি হুযূরের প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমার কথা তোমাদেরকে বলবো? জান, ফাতিমা নিজের হাতে যাঁতা ঘুরাতেন। ফলে হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিজেই পানির মশক বয়ে নিয়ে আসতেন। তাই বুকে দড়ির নিশানা পড়ে গিয়েছিল। আর নিজেই ঘর ঝাঁট দিতেন। এতে তাঁর কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেত।"[৬৫]

প্রথম খলীফার কন্যা হযরত আসমা (রাঃ)-ও নিজের কাজ করে খেতেন। তিনি তাঁর একদিনের ঘটনা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন ঃ

> আমার স্বামী যুবায়র (রাঃ)-এর মদীনা থেকে দূরে এক টুকরা যমীন ছিল। সেখান হতেই আমি খেজুরের বীচি বয়ে নিয়ে আসতাম। একদিন ঐ ভাবেই আসছিলাম। খেজুরের বোঝা আমার মাথায় ছিল। পথে দেখলাম নবী-এ করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের এক জামাত সহ উটে সোয়ার হয়ে এই পথে আসছেন। আমাকে দেখে তিনি উঠ বসালেন এবং আমাকে সোয়ার হতে বললেন। আমার লজ্জা হচ্ছিল, তাই ইতস্তত করতেছিলাম। নবী এ-করীম আমার অবস্থা বুঝে ফেললেন এবং চলে গেলেন।[৬৬]

হযরত উমর (রাঃ) অনেক সময়ই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন ঃ

> তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন মেহনত করে অর্থ উপার্জনের কাজ বন্ধ না করে দেয় এবং এই বলে বেকার বসে না থাকে—হে আল্লাহ্‌! তুমি আমায় খাবার দাও। কারণ তোমরা ভাল করেই জান আকাশ হতে সোনা-চান্দি ঝরে পড়ে না।

৬৫. আবু দাউদ।
৬৬. বুখারী।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকের সামাজিক মর্যাদা

আজকের বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবী আর্থিক মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে এক বিরাট সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে ফেলেছে। বর্তমানে একমাত্র আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরই মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ভরশীল। নৈতিকতা বা মানবতার বিচারে সে যত জঘন্য প্রকৃতিরই হোক না কেন, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকলেই সামাজিকতার সমস্ত উপকরণ তার করায়ত্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বিত্তহীন ব্যক্তি বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার মাপকাঠি অনুযায়ী তার কোন মূল্যই নেই।

এর ফলে সাধারণ জনদের সামাজিক মূল্য কতটুকু নীচু হয়ে যেতে পারে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আমরা বর্তমানের সামাজিক পরিবেশে ভূরি ভূরি পাই।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই হোক বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথাই বলুন, উভয়ই আর্থিক মানদণ্ডের উপর নির্ভরশীল সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। পুঁজিপতি এবং সমাজতান্ত্রিকতার সৃষ্ট আমলাগোষ্ঠীর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন কোন ফারাক নেই—শোষণের রূপ হিসাবে শুধু আজ তাদের পরস্পরে ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

একজন শ্রমিক, যেহেতু তার কোন অর্থবল নেই, তাদের কাছে সে মর্যাদায় ডাস্টবিনের এঁটোচাটা নিকৃষ্ট এক ধরনের জীবের মতই। তাই আমরা দেখি, আজকের শ্রমিকদের অবস্থা প্রাচীনকালের দাসদের সামাজিক মর্যাদার চেয়েও হীন হয়ে পড়েছে।

ইসলাম এসেছে মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে। উপরোক্ত বস্তুতান্ত্রিক আদর্শদ্বয়ের বিপরীতে ইসলামের দৃষ্টিতে আর্থিক সঙ্গতিই সমাজে স্থান লাভের উপায় নয় বরং প্রত্যেক সৎকর্মশীল পরহিযগার ব্যক্তিই এতে মর্যাদার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে। সে জন্মগত বা পেশাগত দিক থেকে যত নীচু মানেরই হোক না কেন, সে আপন কর্মের মাধ্যমে সমাজে স্বীয় মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা পায়।

www.pathagar.com

এই মৌলিক সত্যটির দিকেই ইঙ্গিত দিতে যেয়ে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—তোমাদের মধ্যে তারাই বেশী মর্যাদাবান যারা অধিক আল্লাহ্ভীরু—পরহিযগার।[৬৭]

ইসলাম তথাকথিত আভিজাত্যের চকচকে ঠুন্কো আবরণকে ভেঙে চুরচুর করে দিয়েছে, আঘাত হেনেছে ভুয়া আভিজাত্যবোধের ভিত্তিমূলে। এখানে বড় কথাই হল—'মুমিন'-এরা ভাই ভাই।' সামাজিকতায় কারো কোন প্রাধান্য নেই। নবী করীম (স.) ফরমান ঃ

আজমের উপর আরবের, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্যই নেই।[৬৮]

ইসলামের উক্ত মৌল বক্তব্যটিই নবী করীম (স.)-এর অপর একটি হাদীসে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন—হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তোমাদের প্রভু পরওয়ারদিগারে আলমের ফরমান এই-তোমাদের অধিক আল্লাহ্ভীতি সম্পন্ন ব্যক্তি-ই আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত। তোমরা জান যে, সমগ্র মানব এক আদমেরই সন্তান এবং আদম মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্ট। এরপর তোমাদের মধ্যে অহঙ্কারের আর কি রয়েছে।[৬৯]

ইসলামের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই ফলশ্রুতিতে আমরা ইসলামের ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে, একজন সৎকর্মশীল পরহিযগার শ্রমজীবী হাজারো মিলিয়নার হতেও অনেক উঁচু মর্যাদায় আসীন—পেশায় শ্রমিক বলে এখানে তার মর্যাদাহানিকর কোন পরিস্থিতি নেই। ইসলাম তার মর্যাদা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত করেছে।

একটি হাদীসে অধীনস্থদের—খাদেমদের মর্যাদার সার্বিক মূল্যায়ন করতে যেয়ে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেন ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে কেউই কোন কাওম-ই মানবতার ঊর্ধ্বে নয়। তার কাছে মনিব-চাকর, উচ্চ-নীচ এবং গরীব ও আমীর সকলেই সমান। কারও মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে একমাত্র পার্থক্যের কারণ হতে পারে—পরহিযগারী ও সৎকর্ম। এ-ই যখন তোমাদের প্রকৃত অবস্থা, তখন কেন তোমরা অধীনস্থ লোকদের নিকৃষ্ট মনে কর?

---

৬৭. "ইন্না আক্রামাকুম ইন্দাল্লাহে আত্কাকুম।"

৬৮. যাদুল মাআদ।

৬৯. কান্যুল উম্মাল।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) আরও ফরমান—এমনও হতে পারে যে, খাদেম তার মনিব অপেক্ষা উত্তম এবং এও বৈচিত্র্য নয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে খাদেমের কর্মই অধিক পসন্দনীয় হবে।[৭০]

অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (স.) উক্ত বক্তব্যটি প্রাক-ইসলামী যুগের নজীর এনে আরও প্রাঞ্জল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "আমি দেখেছি, তোমরা তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে কর এবং তাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ কর না। এ কি ব্যাপার? এ কি জাহিলিয়ত যুগের অহঙ্কার নয়? নিশ্চয়ই এ জুলুম ও অন্যায়। আমি জানি প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না, তাদেরকে জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করা হত। তৎকালীন বিত্তবান এবং সর্দার ব্যক্তিরাই তাদের মান ও ইয্যতের মালিক মোক্তার হত। আর আল্লাহ্‌র বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান এবং অধীনস্থগণও ইনসাফ পাওয়ার অধিকারী। সে যুগের কথাও আমার মনে আছে যখন ধনাঢ্য ও সর্দার ব্যক্তিরা নিজেদেরকে মানবতার ঊর্ধ্বে মনে করত এবং তাদের কোন অপরাধ হতে পারে না বলে প্রচারণা চালাত। তারা মনে করত—খাদেমগণের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল মালিকদের খেদমত করা এবং তাদের জুলুম সহ্য করা। মালিকদের কাছে সেবকদের ওঠা-বসা নিষিদ্ধ ছিল। সামনে কথা বলা এবং তাদের কোন কাজে আপত্তি প্রকাশ করাও হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু ইসলাম এ সকল কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেছে এবং জাহিলিয়তের সকল অহঙ্কার উচ্ছেদ করে দিয়েছে।[৭১]

ইসলামের অনেক নবী আলায়হিমুস্‌সালাম-ই শ্রম বিনিয়োগ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

আমরা জানি, খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও একজন শ্রমজীবী ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি নিজের শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভের অংশীদার হিসাবে অর্থাৎ মুজারাবাতের ভিত্তিতে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসায় খেটেছেন।[৭২]

তাঁর মত একজন বিত্তহীনের গলায় সততা ও প্রজ্ঞার সম্যক পরিচয় পেয়েই খাদীজার মতন বিরাট পুঁজির অধিকারিণী এক মহিয়সী নারী

৭০. কানযুল উম্মাল।
৭১. কানযুল উম্মাল।
৭২. জুরকানী

www.pathagar.com

মালা পরিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

নবী করীম (স.) নিজের মেহনতি যিন্দেগীর কথা বলতে যেয়ে একদিন বলেছিলেন ঃ

দুনিয়াতে আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি বকরী চরান নি।

তখন সাহাবা-ই-কিরাম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হুযুর! আপনিও!"

নবী করীম (স.) জওয়াবে বললেন—"হাঁ, আমি কিরাত দু'কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরিয়েছি।[৭৩]

একবার সাহাবা-ই-কিরামসহ নবী এক সফরে বের হয়েছেন। কোন এক মনযিলে সাহাবা-ই-কিরাম সাজারা-এ-এরাকের ফল তালাশ করে করে খেতে লাগলেন। তখন নবী করীম (স.) তাদেরকে বললেন—"কালো কালো দেখে খেয়ো।"

ঃ হুযুর আপনি কি বকরী চরাতেন? আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাহাবা-ই-কিরাম। নবী করীম (স.) বললেন—"হাঁ, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বকরী আমি চরাতাম।"[৭৪]

হযরত মুসা আলায়হিস সালামও হযরত শোআইব আলায়হিস্ সালামের এখানে নির্বাসিত জীবন কাটানোর সময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খেটেছেন। নবী করীম (স.) হযরত মুসা এবং অন্যান্য আম্বিয়া-ই-কিরাম আলায়হিমুসসালামের জীবন যাত্রার কথা বলতে যেয়ে বলেন ঃ

> হযরত দাউদ কর্মকার ছিলেন; হযরত আদম কৃষক ছিলেন, হযরত নূহ্ ছুতার, হযরত ইদ্রিস দরজি আর মুসা আলায়হিমুসসালাম বকরী চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[৭৫]

মেহনত করে, গতর খেটে খেয়েও তারা নবীর সুমহান মর্যাদা পেয়েছিলেন। আর নবীর সামাজিক সম্মান? তা বলাই বাহুল্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নসিহত করেই ক্ষান্ত হন নি, এ শুধু তাঁর কথার প্রলেপ ছিল না, অধিকন্তু মদীনায় তিনি যে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন সেখানে সৎকর্মশীল শ্রমিকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েও দিয়েছিলেন।

৭৩. বুখারী।
৭৪. বুখারী।

www.pathagar.com

আমরা জানি, তিনি তাঁর প্রাণাধিকা মেয়ে হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) হযরত আবূ বকরের (রাঃ) মত ব্যবসায়ী প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও হযরত আলীর (রাঃ) মত একজন শ্রমজীবীর হাতেই তুলে দিয়েছিলেন—যাকে য়াহূদীর ক্ষেতে মজুরী খাটতেও দেখা যায়।

হযরত আলী নিজে তাঁর মেহনতী যিন্দেগীর কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলতেন ঃ

> মদীনায় থাকাকালীন একবার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে শহরতলির দিকে কাজের তালাশে বের হয়ে পড়লাম। এক স্থানে একটি মেয়েকে মাটি জমা করতে দেখতে পেলাম। মনে হল—সে হয়ত তা ভিজাবে।
>
> তখন এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক এক বালতি পানি তুলে দেওয়ার কাজে লেগে গেলাম। পর্যায়ক্রমে ষোল বালতি পানি তুললাম। এতে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেল। কাজ সেরে পানির কাছে গেলাম, হাত মুখ ধুলাম। মেয়েটি আমাকে ষোলটি খোরমা পারিশ্রমিক দিয়ে দিল। তা নিয়ে নবী করীমের কাছে আসলাম। সবিস্তার উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর নবী করীমও আমার সঙ্গে তা খেলেন।[৭৫]

আর একদিনের কথা তিনি বর্ণনা করেন ঃ

> বদরের জিহাদে একটি উট পেয়েছিলাম। রসূলে করীমও খুমুছ হাতে আমাকে অন্য একটি উট দিয়েছিলেন। হযরত ফাতিমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাকে ঘরে আনার ইচ্ছা হলে বানু-কায়নুকার এক স্বর্ণকারকে বললাম ঃ চল, মদীনার শহরতলিতে যাই, ইজখার ঘাস কাটবো। ইচ্ছা ছিল, ঘাস কেটে কোন স্বর্ণকারের কাছে তা বিক্রি করে যা রোজগার হবে তা দিয়ে ফুলসজ্জার রাতের ওলিমার বন্দোবস্ত করব।[৭৬]

হযরত আলী (রাঃ) মেহনতি হয়েও মুসলমানদের মধ্যে কতটুকু মর্যাদার অধিকারী তা সকলেই জানে। তাই আমরা দেখি, মুসলিম সমাজ তাঁর মত একজন শ্রমজীবীকে নিজেদের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে নিতেও দ্বিধা করে নি। খলীফা হয়ে যাওয়ার পরও তিনি খেটেছেন।

---

৭৫. মুস্তাদ্‌রাকে হাকিম।

৭৬. আহমদ, মাজ্‌মাউজ্‌ জাওয়ায়িদ, চতুর্থ খণ্ড—কৃত নূরুদ্দীন হায়সামী।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-ও একজন রাখাল ছিলেন। মক্কার অদূরবর্তী কাদীদ থেকে দশ মাইল দূরে জান্‌জান ময়দানে তাঁকে উট চরাতে হত। খিলাফতের পর একবার এই মাঠ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল; চোখে পানি নেমে এল। সঙ্গীদেরকে তখন নিজের কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বললেন ঃ

> এমন এক সময় ছিল—যখন ঘোড়ার জিনের মামুলি এক টুকরো কাপড় পরে এই মাঠে আমি উট চরাতাম। পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লে পিতা বেদমভাবে প্রহার করতেন। আর আজ, আল্লাহ্‌ ছাড়া আমার উপর কেউ হাকিম নেই।[৭৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ), রিওয়ায়েতে হাদীস যার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল; তিনিও ছিলেন শ্রমজীবী সাহাবাগণের অন্যতম। মদীনায় দরবারে নববীতে হিজরত করে চলে আসার পর একটি মেয়ের বাসায় থাকতেন। শ্রমের বিনিময়ে তাঁকে জীবিকা চালাতে হত। তিনি নিজে বলেন ঃ

> আমি বুছরা-বিনতে-গাজওয়ানের ঘরে খাবার এবং এক জোড়া জুতার বিনিময়ে কাজ করতাম। তারা উটে আরোহণ করলে তা হাঁকিয়ে নিয়ে যেতাম এবং নেমে আসলে তাঁদের খেদমত করতাম। একদিন আমাকে ঐ মেয়ে আদেশ করল—খালি পায়ে নেমে যাও, আবার উট দাঁড়ানো রেখেই এতে উঠে বস। অর্থাৎ জুতা জোড়া পরার এবং উট বসাবার সময়টুকুও দিত না।
>
> আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত দেখ, আজ ঐ মেয়ে-ই আমার অর্ধাঙ্গিনী বলে পরিচিতা। বিয়ের পর একদিন তাকে (রসিকতা করে) বললাম—জুতা না পরে এবং উট না বসিয়েই এতে চড়ে বস।[৮০]

এর চেয়েও আর সামাজিক সাম্য কি হতে পারে যে, একজন মেহনতী তারই মালিককে অনায়াসে বিয়ে করে নিতে পারে—অহেতুক আভিজাত্যের অহমিকা যেখানে কোন বাধার-ই সৃষ্টি করতে পারে না।

ইসলাম এক-একজন শ্রমজীবীর জন্যও অফুরন্ত সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তার জীবনে অপরিমেয় সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই আমরা

৭৮. বুখারী।
৭৯. তবকাত-ই-ইবনে সাআদ।
৮০. তবকাত-ই-ইবনে সাআদ, চতুর্থ খণ্ড।

www.pathagar.com

দেখি, ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় একজন মজুরও রাষ্ট্রীয় কর্ণধার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

ঐ আবু হুরায়রা (রাঃ) পরে মদীনার গভর্নর হয়েছিলেন। এক-দিন তিনি কাত্তান জাতীয় কাপড় দিয়ে নাক ঝাড়ছিলেন আর নিজেকেই বলছিলেন ঃ

> বাহ! বাহ! আবু হুরায়রা! আজ কাত্তান দিয়ে নাক ঝাড়ছ! কিন্তু একদিন তোমার এমন অবস্থা ছিল যে, এই মদীনাতেই ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মসজিদে এসে হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরা এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে। আর লোকেরা পাগল মনে করে ঘাড়ে এসে চাপ দিয়ে ধরত।

এরপর তিনি পূর্বোল্লিখিত ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন ঃ

> ইয়াতিম হয়ে জন্মেছি, সম্বলহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করেছি এবং আমি একজন বেতনভুক শ্রমিক ছিলাম। ঐ আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা যিনি ইসলামকে মজবুত করেছে। আর আবু হুরায়রাকে কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।[১]

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-ও একজন শ্রমজীবী সাহাবা ছিলেন। মক্কার কুরায়েশ সর্দার উকবা-ইবনে-আবি মুআইতের ঘরে তিনি গতর খাটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এই ইবনে-মাসউদই হলেন শরীয়তে ইসলামীর অন্যতম ব্যাখ্যাতা—শরয়ী আহকামের তফসীর অনেকটা তাঁর উপরই নির্ভরশীল। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে কুফাবাসীদের শিক্ষাদাতা হিসাবে পাঠিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মনে তাঁর কি মর্যাদার আসন সংরক্ষিত ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাক্যাংশ দ্বারা এর কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাঁকে যখন কুফায় পাঠাচ্ছিলেন তখন সেখানকার অধিবাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

> ইবনে মাসউদকে তোমাদের এখানে পাঠিয়ে প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছি। —তার থেকে লাভবান হওয়া আমার বেশী জরুরত ছিল। কিন্তু তোমাদের কথা লক্ষ্য

৮১. তবকাত-ই-ইবনে সাআদ।

www.pathagar.com

করে তাঁকে তোমাদের কাছেই পাঠাচ্ছি এবং আমার ক্ষতি স্বীকার করে নিচ্ছি।[৮২]

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন ঃ

তাঁর [ইবনে মাসঊদ (রাঃ)] এবং তাঁর আম্মার নবী করীম (স.)-এর পরিবারের সঙ্গে এত সম্পর্ক ছিল যে, আমরা প্রথম প্রথম যখন মদীনায় আসলাম তখন ইবনে মাসঊদকে হুযূরের পরিবারেরই একজন বলে মনে করেছিলাম।[৮৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন—ইবনে মাসঊদ আমার উম্মতের জন্য যা পসন্দ করে তা-ই আমি তাদের জন্য পসন্দ করি।[৮৪]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মাসঊদ (রাঃ) শ্রমজীবী সাহাবাদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলতেন ঃ

রসূলে পাক আমাদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে বললে আমাদের কেউ বাজারে চলে যেত এবং এক মুদের' বিনিময়ে মুটে-মজুরের কাজ করত। এইভাবে যা পেত আল্লাহ্‌র রাস্তায় তা ব্যয় করে দিত। আজ তাদেরই অনেকের কাছে একশত হাজার দিরহামও পড়ে রয়েছে।[৮৫]

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, এখানে আসলে হযরত আবু মাসঊদ নিজের অবস্থাই ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম দাস-শ্রমিকদেরকেও মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। তাদেরকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে। দাস-শ্রমিক বলতে প্রাক-ইসলামী যুগে যা বোঝাত, ইসলাম তার অর্থ বদলে দিয়েছে।

হযরত বিলাল, আম্মার, খাব্বাব, সুয়াইব, যায়দ, উসামা (রাঃ) প্রমুখ সকলেই মাওয়ালী বা আযাদকৃত দাস-শ্রমিক ছিলেন। কিন্তু এঁদের সামাজিক মর্যাদা অনেকের চেয়েও উপরে। মুসলমানদের কাছে তাঁরা কতটুকু সামাজিক সম্মানের অধিকারী তা আমরা সকলেই জানি।

---

৮২. আল্ ওয়া'দুল হক—ডাঃ তোয়াহা হুসাইন।
গোলামানে ইসলাম—মাওলানা সাঈদ আহমদ।
৮৩. বুখারী।
৮৪. কানযুল উম্মাল।
৮৫. বুখারী।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) হযরত যায়দ (রাঃ)-কে আযাদ করে দিয়ে নিজের পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমরা যারা উপস্থিত আছ সকলেই জেনে রাখ, যায়দ আমার পুত্র।[৮৬]

মক্কার অভিজাতশ্রেষ্ঠ কুরায়শী কন্যা, নবী করীম (স.)-এর আপন ফুফাত বোন হযরত যয়নব (রাঃ)-কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বংশমর্যাদার কথা ভেবে হযরত যয়নব এবং তাঁর ভাই কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু তখনই আল্লাহ্ পাক আয়াত নাযিল করেন —আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যখন কোন কিছুর ফয়সালা করেন তখন আর কোন মুমিনেরই কোন রকমের অধিকার থাকতে পারে না।[৮৭]

হযরত আয়েশা (রাঃ) যায়দ সম্পর্কে বলতেন, যদি হযরত যায়দ জীবিত থাকতেন তবে নবী করীম (স.) তাঁকে ছাড়া আর কাউকে খলীফা বানাতেন না।

তাঁরই ছেলে হযরত উসামা (রাঃ)-কে নবী করীম (স.) এত ভালবাসতেন যে, হযরত হাসানও তাঁকে এক সঙ্গে ধরে বলতেন, 'আল্লাহ্! আমি এদেরকে ভালবাসি, তুমিও এদেরকে মাহবুব করে নিয়ো।[৮৮]

মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী করীম (স.) মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর চাচাত ভাই ফজল ইবনে আব্বাস এবং হযরত উসামা (রাঃ) তাঁর সঙ্গে একই বাহনে সওয়ার ছিলেন। ইসলাম জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিল কুরায়শ সরদারের ছেলে আর গোলামের ছেলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

তাঁদের মান-মর্যাদা নবী করীম (স.) নিজেরই মর্যাদা বলে মনে করতেন। একবার হযরত উসামার জন্ম নিয়ে কিছু কানাঘুষা চলছিল—এতে নবী করীম (স.) অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন উসামা ও যায়দ (রাঃ) পিতা-পুত্র একই চাদরের নীচে শোয়া ছিলেন, তাদের পা-গুলো শুধু বের হওয়া অবস্থায় ছিল। তা দেখে আরবের এক প্রখ্যাত কেয়াফা শানাস (যে ব্যক্তি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রেখা পর্যবেক্ষণ করে লোকের সঠিক পরিচয় নিরূপণ করতে পারে) বলেছিল—এরা একজন অপর জনেরই অংশ। একথা শুনে নবী করীম (স.) এত খুশী হয়ে উঠেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (স.)-এর চেহারা মুবারক প্রফুল্ল হয়ে উঠতে দেখেছিলাম।[৮৯]

---

৮৬. খমীস, গোলামানে ইসলাম—মাওলানা সাঈদ আহমদ।

৮৭. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۝

৮৮. বুখারী।

৮৯. বুখারী।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে সর্বশেষ যে মুজাহিদ বাহিনী কাফিরদের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন তার সেনাপতি নির্বাচন করেছিলেন এই উসামাকেই। আর আবু বকর, উমর, আবু উবায়দা (রাঃ) প্রমুখ অভিজাতশ্রেষ্ঠ সেনাপতি তাঁরই অধীনে সাধারণ সৈনিক ছিলেন মাত্র।[৯০]

হযরত বিলাল ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন রূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে নবী করীম (স.) বলেছিলেন,—আমি বিলালকে মুয়ায্যিন মনোনীত করেছি, কারণ সে আমাদের ভাই।[৯১]

আরব-মুশ্‌রিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধ কা'বা ঘরের মর্যাদা রক্ষার নাম নিয়েই করেছিল। নিজেদের দেব-দেবীর মর্যাদা রক্ষার্থে তারা মুসলমানদের উপর হাজারো কোড়া মারতেও দ্বিধা করে নি। আর এদের অন্যতম শিকার ছিলেন হযরত বিলাল।

মক্কা বিজয়ের দিন, যেদিন নবী করীম (স.) কয়েকশ' বছর পর কা'বা ঘরকে দেব-দেবীর মূর্তি থেকে মুক্ত করেছিলেন; ঐ দিন কা'বা ঘরে ঢোকার সময় বিলাল ও উসামা (রাঃ)-কে নিয়েই ঢুকেছিলেন। ইবনে উমর বর্ণনা করেন,—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কা'বা ঘরে ঢুকলেন, আর তার সঙ্গে বিলাল, উসামা ইবনে যায়দ এবং চাবি-রক্ষক উসমান ইবনে তালহা (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা ঢুকে দরওয়াজা বন্ধ করে দিলেন।"[৯২]

নবী করীম (স.) সব সময়ই চাইতেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা যেন অপরাপরদের মতই থাকে। একবার এক আরবী অভিজাত ইবনে আবী বকর এসে নবী করীম (স.)-কে অনুরোধ জানান—ইয়া রসূলুল্লাহ্, কোন আরবী ভদ্রজনের সঙ্গে আমার বোনকে বিয়ে দিয়ে দিন।

নবী করীম (স.) জওয়াবে বললেন—বিলালের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও না কেন?

কিছুই জওয়াব না দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

---

৯০. বেদায়া ওয়ান্‌নেহায়া—লি ইবনে কাসীর।

৯১. কানযুল উম্মাল।

৯২. বুখারী।

www.pathagar.com

পরদিন এসে ঐ কথাই আবার তিনি নবী করীম (স.)-কে বললেন। হুযুরের আগের জওয়াবই দিলেন। এই দিনও তিনি কিছু না বলে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন এসে পুনরায় পূর্ব বক্তব্যই দরবারে নববীতে আরয করলেন। তখন নবী করীম (স.) তাঁকে বললেন, 'আরে! এক জান্নাতির কাছে তোমার মেয়ে বিয়ে দাও না কেন?'

শেষে তিনি বললেন, 'আপনার মতই আমার মত।'[৯৩]

হযরত উমর (রাঃ) হযরত বিলালকে আসতে দেখলে উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন—আবু বকর আমাদের সরদার ছিলেন এবং তিনি আমাদের নেতা বিলালকে আযাদ করেছেন।[৯৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখতেন, কেউ যেন তাদেরকে মর্যাদায় নীচু মনে না করে। একবার দরবারে নববীতে হযরত উমর (রাঃ)-এর জবান থেকে বের হয়ে পড়ল,—বিলাল, তুমি কাল এক হাবশী···।

এ শুনে নবী করীম (স.) বললেন, উমর, এখনো তোমার মধ্যে জাহিলিয়তের অন্ধ আভিজাত্যের গন্ধ রয়ে গেছে।

হযরত উমর অনুশোচনায় মাটিতে নুইয়ে পড়লেন। উঠতে বলা হলে বললেন, বিলাল আমাকে পা দিয়ে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত আমি উঠব না।

শেষে সত্যই তিনি বিলালকে বাধ্য করলেন তাঁকে পা দিয়ে উঠিয়ে দিতে।[৯৫]

একবার কি নিয়ে জানি, আবু যর (রাঃ)-এর সঙ্গে হযরত বিলালের মনোমালিন্য ঘটে গিয়েছিল। আবু যর আরবের প্রখ্যাত অভিজাত গোত্র গিফারের সরদার ছিলেন। তিনি নিজেকে হযরত বিলাল (রাঃ) অপেক্ষা কিছুটা উচ্চ বংশজাত মনে করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে বলে উঠলেন,—আও! বান্দীর বেটা।

নবী করীম (স.) যখন একথা শুনলেন তখন আবু যরকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,—তুমি একে গালি দিয়েছ?

তিনি শরমে মরে যাচ্ছিলেন। ছোট করে বললেন,—হ্যাঁ।

৯৩. ইবনে সা'দ।

৯৪. বুখারী, মিশকাত, আল-ওয়াদুল হক্ক।

৯৫. আল-বালাগ, শওয়াল—১৩৮৭ হিঃ।

www.pathagar.com

ঃ তার মার নাম জড়িত করে গালি দিয়েছ ?
আবূ যর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন।

এরপর অধীনস্থ খাদিমদের পরম নির্ভরস্থল মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন,—আবূযর, তোমার গোঁয়াতুমি এখনও যায় নি। নবী করীম (স.) সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রকৃত মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে ইরশাদ করলেন,—আবূযর, এরা (নীচ নয়) তোমাদের ভাই, তোমাদের খেদমত করছে।[১৬]

সালার-ই-আ'জম কুরায়শী সর্দার, খালিদ ইবনে ওয়ালীদের সঙ্গে হযরত আম্মার (রাঃ)-এর কি নিয়ে যেন বিবাদ চলছিল। খালিদ (রাঃ) তখন সবেমাত্র মুসলমান হয়েছেন। মুসলিম সমাজে এঁদের কি মর্যাদা তা তখনও তিনি পুরোপুরি জানতে পারেন নি। তাই একদিন রাগ করে আম্মার (রাঃ)-কে বলে ফেললেন,—তোমার মা সুমাইয়া আমার চাচা আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাসী, আর তোমার পিতা আমারই চাচার আশ্রিত ছিল। তাঁর কথায় কিছুটা আভিজাত্য-গরিমার ভাব এসে গিয়েছিল। হযরত আম্মার (রাঃ) নবী করীম (স.)-এর কাছে এলেন এবং ঘটনা বিবৃত করলেন। ততক্ষণে খালিদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি পূর্বের মতই রাগের মাথায় কথা বলছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন। এরপর আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন,—"আম্মারকে যে অসন্তুষ্ট করবে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

খালিদ (রাঃ) লজ্জায় অনুশোচনায় শরমে মরে গেলেন। আর ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ এমন যে, একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ কুরায়শী সন্তান তারই চাচার এক নিগ্রো দাসীর ছেলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। হযরত আম্মার (রাঃ) যতক্ষণ না তাঁকে মাফ করলেন, তিনি শান্ত হলেন না।[১৭]

হযরত আম্মার (রাঃ)-এর মর্যাদা নির্ণয় করতে যেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন—আম্মার যে দিকে থাকবে সত্য ও ন্যায় সেদিকেই থাকবে।[১৮]

---

১৬. মুসনাদে ইমাম আহমদ, হযরত আবূযর গিফারী—সাইয়েদ মানাজির আহসান গিলানী।
১৭. আহমদ, মিশকাত, আল-ওয়া'দুল হক্ক।
১৮. আল-ওয়া'দুল হক্ক।

www.pathagar.com

হযরত আম্মার (রাঃ) নবী করীম (স.)-এর কাছে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠতেন। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আম্মার (রাঃ) রসূলে পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন—তাঁকে অনুমতি দিয়ে দাও। খোশ আমদেদ তাকে, যে ব্যক্তি নিজেই পবিত্র এবং পুণ্য ও পবিত্র কার্যের অধিকারী।[৯৯]

হযরত উমর (রাঃ) আহত হওয়ার পর, খলীফা নির্বাচনের প্রশ্ন এলে তিনি বলেছিলেন—আজ যদি আবু উবায়দা অথবা আবু হুযায়ফার গোলাম, হযরত সালেম জীবিত থাকতেন, তবে তাঁকেই আমার প্রতিনিধি এবং মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়ে যেতাম।[১০০]

তাঁর দৃষ্টিতে খিলাফতের উপযুক্ততায় কুরায়শ সন্তান আবু উবায়দা আর পার্শী দাস-শ্রমিক সালেমের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই আমরা দেখি, আবদুল্লাহ্ ইবনে জুদাআনের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সুহাইব (রাঃ)-কে তিনি খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের ইমামতের ভার দিয়েছিলেন এবং তাঁকেই নিজের নামাযে জানাযা পড়তেও অসিয়ত করে গিয়েছিলেন। আনসার ও মুহাজির কেউই এতে কোন আপত্তি তোলেন নি।[১০১]

নবী করীম (স.) ও সাহাবা-ই-কিরামের উক্ত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজে কুলি-মজুরদের এমন স্থান লাভ হয়েছিল, যা আর কখনও নীচু হয় নি।

খিলাফতে রাশিদার পর ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূল কাঠামো পরিবর্তন হয়ে পড়ে। বনী উমাইয়াগণ আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজেদের সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। আরব আভিজাত্যের সংরক্ষণই এঁদের বুনিয়াদী লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা মাওয়ালী বা আযাদকৃত দাস-শ্রমিকদের প্রকৃত মর্যাদা দানে তেমন আগ্রহী ছিল না। ফলে তাঁদের সময়ে মর্যাদা সংরক্ষণে এক মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার কথা ছিল। কি আশ্চর্যের বিষয়, এ একমাত্র ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যে, রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য না থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে তাদের পূর্ব মর্যাদায় কিছুই কমতি হয়

৯৯. তিরমিযী, মিশ্‌কাত।

১০০. গোলামান ইসলাম।

১০১. তারীখে ইবনে আসীর আল-ওয়াদুল হক্ক।

www.pathagar.com

নি। কারণ তখনও ইসলামী সমাজ পুরোপুরিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায় নি, রসূলে করীম (স.)-এর আদর্শ হতে দূরে সরে যায় নি।

তাই আমরা দেখি, রসূল-ই-পাকের বংশধর অভিজাতশ্রেষ্ঠ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন নিজের এক দাস-শ্রমিককে স্বাধীন করে দিয়ে তাঁর ঔরসজাত মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে এতটুকুও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ঠিক এমনিভাবে নিজেও এক মেয়ে দাস-শ্রমিককে স্বাধীন করে আপন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন।

এই খবর রাজধানীতে পৌঁছলে তদানীন্তন উমাইয়া বাদশা আবদুল মালিকের আরব আভিজাত্যের উপর প্রচণ্ড ঘা লাগে। কিন্তু তাঁকে কিছু করার মত তার ক্ষমতা ছিল না। তাই তাঁকে ব্যঙ্গ করে এবং তাঁর বংশ-মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে এক চিঠি লিখে পাঠান। তখন তার জওয়াবে ইমাম জয়নুল আবেদীন লিখেছিলেন:

> কুরআনের আয়াত, "তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।" আর তিনি য়াহুদী মেয়ে সুফিয়া (রাঃ)-কে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর দাস-শ্রমিক যায়দ ইবনে হারিসকে স্বাধীন করে দিয়ে আপন ফুফাত বোন যয়নব (রাঃ)-কে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তা-ই করেছি।[১০২]

পূর্বেই বলেছি, ইসলাম একমাত্র সৎকর্মশীলতারই মর্যাদা দিয়ে থাকে। সে গুণের ভিত্তিতেই মানুষকে যাচাই করে থাকে, জন্ম বা পেশার ভিত্তিতে নয়। আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি পুরুষ ও স্ত্রী সমবায়ে পয়দা করেছি এবং তোমাদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের সৃষ্টি করেছি। এ শুধু পরস্পরের পরিচয়ের জন্যেই। আল্লাহ্র কাছে তারই মর্যাদা বেশী, যে অধিকতর সৎকর্মশীল। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং খবর রাখেন।[১০৩]

এরই কারণে ইসলামী সমাজ আল্লাহ্র অনুগত সজ্জনদেরকেই মাথায় তুলে নিয়েছিল। সে সমাজের কোন্ স্তর হতে এসেছে, তার পেশাই বা কি, কেউ কোন দিন এ প্রশ্ন তোলে নি।

খিলাফতে রাশিদার পর আরব অভিজাতগণ যখন রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন, তখন ঐ মাওয়ালীগণের (আযাদ কৃত দাসশ্রমিক) হাতেই মুসলিম সমাজের নৈতিক নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয়েছিল।

---

১০২. তবকাত-ই-ইবনে সাআদ।

১০৩. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ০

www.pathagar.com

আজ আমাদের সামনে ইসলামী ফিকহ্ ও হাদীসের সংরক্ষিত যে অতুল ভাণ্ডার বিদ্যমান, তা প্রকারান্তরে ঐ মাওয়ালী বা আযাদকৃত দাস শ্রমিকদের প্রচেষ্টার ফল। মকহুল, নাফে, সালেম, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, ইবনে মুবারক প্রমুখ প্রায় সকল ইসলামী শাস্ত্রবেত্তা মাওয়ালী বা আযাদকৃত দাস-শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইসলাম তাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষারও অফুরন্ত সুযোগ এনে দিয়েছিল। সাহাবা-ই-কিরাম নিজেদের সন্তানের মতই বরং অনেক ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশী মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে এদেরকে শিক্ষা প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা আবুল আ'লিয়া নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে বলতেন—"আমি দাস-শ্রমিক ছিলাম; মালিকের খিদমত আঞ্জাম দিতাম। (আর ঐ সময়ই) আমি কুরআনে করীম হেফ্জ করে নিয়েছিলাম এবং আরবী অক্ষর লিখন পদ্ধতিও আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম।"

তিনি একাই নন, তাঁর সঙ্গে ঐ শ্রেণীর বিরাট একদল এভাবেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেন—আমরা এক জামা'আত ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করত; আর অন্যরা নিজ নিজ মালিকের খিদমত করত। তা সত্ত্বেও, আমরা প্রত্যেকেই রাত্রে কুরআন করীমের এক এক খতম পড়তাম।[১০৪]

তারা জ্ঞান-গরিমায় এমন প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিজাতদের তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত, তাদের দুয়ারে এসে ধর্ণা দিতে হত।

আত্মগর্বী উমাইয়া বাদশাহ আবদুল মালিক হাজারো তালাশ করার পরও কোন মননশীল অভিজাতকে না পেয়ে তাঁর সন্তানদের শিক্ষার ভার ইসমাইল ইবনে উবায়দিল্লাহ্র হাতে তাকে তুলে দিতে হয়েছিল।[১০৫]

ইমাম জয়নুল আবেদীন হযরত উমর (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস-শ্রমিকের কাছে তালিম হাসিলের জন্যে গিয়ে বসতেন। একবার একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করল—আপনি কুরায়শী মজলিশ ছেড়ে দিয়ে মাওয়ালীদের এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন কেন? তিনি জওয়াবে বললেন, (এখানে আভিজাত্যের প্রশ্ন নয়) যার কাছে গেলে কিছু শিখা যায়, তার কাছেই মানুষের যাওয়া উচিত।[১০৬]

১০৪. তবকাত-ই-ইব্নে সাআদ।
১০৫. তবকাত-ই-ইব্নে সাআদ।
১০৬. তবকাত-ই-ইবনে সাআদ।

www.pathagar.com

হযরত আনাস (রাঃ), যিনি দীর্ঘ দশ বৎসর রসূল-ই-পাকের খিদমত করেছেন—তাঁর কাছে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে আসলে বলতেন—আমাদের মাওলা হাসানকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।'[১০৭]

সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে তাঁদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ছিল। ঐ শ্রেণীর উলামায়ে-ই-কিরাম কি সম্মানের আসন নিয়ে বাস করতেন এর কিছুটা আন্দাজ নিম্নোক্ত ঘটনাটি দ্বারা করা যেতে পারে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইবনে শিহাব জুহ্‌রী উমাইয়া বাদশাহ আবদুল মালিকের এখানে আসলে তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি বলতে পারেন, বিভিন্ন অঞ্চলে আজকাল মুসলমানদের নৈতিক নেতৃত্ব দান করছেন কারা?

ঃ কেন তা পারব না।

ঃ এখন কোন্ শহর থেকে আপনি এসেছেন?

ঃ মক্কা থেকে।

ঃ মক্কায় কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন?

ঃ আতা ইবনে আবি রাবাহ।

ঃ আরবীয় অভিজাত না মুক্তিপ্রাপ্ত দাস?

ঃ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।

ঃ তিনি কি করে এই মর্যাদা পেলেন?

ঃ দীন এবং ইলমে হাদীসের ফলে।

ঃ হ্যাঁ, এতদুভয়ই মানুষকে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। আচ্ছা বলুন ইয়ামেনের মুসলমানদের ইমাম বা পেশোয়া আজকাল কে?

ঃ তাউস ইবনে কায়সান।

ঃ আরবীয় অভিজাত সন্তান না আযাদকৃত দাস?

ঃ আযাদকৃত দাস।

ঃ কোন্ জিনিস তাকে এমন স্থানে এনে পৌঁছাল?

ঃ আতা (রাঃ)-কে যা মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ঃ মিসরের ইমাম কে?

---

১০৭. তবকাত-ই-ইবনে সাআদ।

www.pathagar.com

ঃ ইয়াযীদ ইবনে হাবিব।

ঃ আরবীয় অভিজাত না আযাদীপ্রাপ্ত দাস ?

ঃ তিনিও আযাদীপ্রাপ্ত দাসদের অন্তর্ভুক্ত।

ঃ সিরিয়ায় কার কথা মেনে চলা হয় ?

ঃ মকহুল।

ঃ আরবীয় না আযাদীপ্রাপ্ত দাস ?

ঃ আযাদীপ্রাপ্ত। তিনি দাস-শ্রমিক ছিলেন, এরপর জুহাইল বংশীয় এক মেয়ে তাঁকে আযাদ করে দেয়।

ঃ জজীরা অর্থাৎ দজলা-ফুরাত নদী বিধৌত অঞ্চলের ইমাম কে ?

ঃ মায়মুন ইবনে মিহরান।

ঃ আরব না আযাদীপ্রাপ্ত দাস ?

ঃ আযাদীপ্রাপ্ত দাস।

ঃ খুরাসানের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ লোক আজকাল কোন্ জন ?

ঃ জাহ্হাক ইবনে মুজাহিম।

ঃ আযাদী প্রাপ্ত না আরবীয় অভিজাত সন্তান ?

ঃ আযাদীপ্রাপ্ত।

ঃ বলুন বসরায় বর্তমানে কে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ?

ঃ হাসান ইব্নে আবিল হাসান।

ঃ আরবীয়, না আযাদীপ্রাপ্ত দাস ?

ঃ আযাদীপ্রাপ্ত দাস।

ঃ ওয়াইলাক, আফসোসের কথা। আচ্ছা, কুফার মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃত্বের ভার বর্তমানে কার হাতে ?

ঃ ইবরাহিম নখয়ী (রাঃ)।

ঃ তিনিও কি আযাদীপ্রাপ্ত দাস, না আরবীয় অভিজাত সন্তান ?

ঃ জ্বী হ্যাঁ, তিনি আরবীয় এক সম্ভ্রান্ত আলিম।

ঃ উহ্ ! এতক্ষণে যেয়ে এমন একটি কথা শোনালেন, যাতে আমার মনের কাল ছায়াটা সরে যেতে পেরেছে। একথা যদি না বলতেন তবে আমার কলিজাটা ফেটে যেত।

www.pathagar.com

আরও অনেক কথা এমনিভাবে আবদুল মালিক বলে যাচ্ছিল। তখন ইমাম জুহরী তাকে বাধা দিয়ে বললেন—আমিরুল মুমিনীন; এ হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তার দীনের ব্যাপার। যে-ই দীন হাসিল করবে, সে-ই নেতৃত্বের অধিকারী হবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না তাকে নীচু হয়েই থাকতে হবে।[১০৮]

প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত বর্ণনায় তৎকালীন সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রের রূপটিই ফুটে উঠেছে। মাত্র একটি জায়গা ছাড়া বাকী সব কটি কেন্দ্রে তারাই নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত, যারা মাওয়ালী বা আযাদকৃত দাস-শ্রমিক।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বনু মখজুমের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মুজাহিদকে এত সম্মান করতেন যে, অনেক সময় তাঁর ঘোড়ার লাগাম তিনি ধরে রাখতেন।[১০৯]

ঐ সৎকর্মশীল শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের মনে কি সাধারণ মহব্বত ছিল, আজকের অভিজাতগর্বী সমাজে বসে তা কল্পনাও করা যায় না।

খলীফা হারুন অর রশীদ সাম্রাজ্যের অবস্থা দর্শনে বের হলে বেগম জোবেদাও তাঁর সঙ্গ নিলেন। তাঁরা যখন রিক্কা শহরে অবস্থান করছিলেন, এমন সময়ে খবর এল, মুক্ত দাস শ্রেণীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক শহরে আসছেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, ঐ সময় জোবেদা মহলের ঝরোকা দিয়ে শহরের দূর ছায়াঘেরা দিগন্তের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। হঠাৎ বেশ শোরগোলের আওয়াজ তাঁর কানে আসল। ঐতিহাসিক খতীবের ভাষায়—আকাশ ধূলাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আর মানুষের ভিড়ের চাপে, তাদের পায়ের জুতা ছিড়ে যাচ্ছিল। বেগম জিজ্ঞেস করলেন—এত শোরগোল কেন! ব্যাপার কি? জওয়াব হল—আজ ইবনে মুবারক আসছেন; তাই শহরের অধিবাসীরা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে আসতে চলছে। বেগম বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলতে লাগলেন—আল্লাহ্র কসম, এরই নাম রাজত্ব। এ হারুন-অর-রশীদ নয়—যার জন্য সরকারী চাপ সৃষ্টি করে লোক জমায়েত করতে হয়।[১১০]

১০৮. মারিফাতু উলুমিল হাদীস, তদবীনে হাদীস—আল্লামা মানাযির আহসান গিলানী।

১০৯. বায়হাকী।

১১০. তারিখে বাগদাদ।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস-শ্রমিক ইকরামা (রাঃ) যখন বসরা যান তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে আইয়ুব সিখতিয়ানী বলেন, মানুষ ইকরামাকে একটু দেখার আশায় এভাবে ভেঙে পড়েছিল যে, অনেকে ঘরের ছাদে পর্যন্তও উঠে গিয়েছিল।১১১

ইসলাম সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মালিক শ্রমিকের ব্যবধান দূর করেছে; এমন কি, নামগত পার্থক্যও দূর করে দিয়েছে। শ্রমিকদের মর্যাদাহানিকর কোন শব্দ ব্যবহার পর্যন্ত ইসলাম বরদাশত করেনি। কোন দাস-শ্রমিককে দাস বলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আরবের প্রচলিত ভাষা ছিল, মালিককে 'রব' বা 'প্রতিপালক' বলা যাবে না। কারণ এতে তার মনে অহঙ্কার এবং সে যে শ্রমিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ ধারণার জন্ম হতে পারে। নবী করীম (স.) বলেছেন—তোমাদের মধ্যে কেউ দাস শ্রমিককে 'দাস' বলে ডাকতে পারবে না। আর মালিককেও 'রব' বলতে পারবে না। কারণ তোমরা সকলেই গোলাম। একমাত্র আল্লাহ্ই সকলের 'রব' বা প্রতিপালক।১১২

ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গুণ এ-ই যে, সে শুধু বড় বড় বুলি আউড়িয়ে বসে থাকে নি। সর্বহারাদের অবস্থা উন্নয়নে শুধু মায়া-কান্নাই কাঁদে নি, বরং কার্যকরীভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। মানুষের মন ও মগজে তাদের মর্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

উপরে তত্ত্বমূলক আলোচনা বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত ঘটনার অবতারণা করেছি। শ্রমিকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী নির্দেশাবলী কার্যকর করতে কি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সমাজে সামগ্রিকভাবে এগুলি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা তুলে ধরাই ছিল আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আশা করি, আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট করেই উপস্থাপিত করতে পেরেছি।

---

১১১. তবকাত-ই-ইবনে সা'আদ।

১১২. আবু দাউদ।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক

আজকাল শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক এক বিরাট জটিল সমস্যা নিয়ে বিদ্যমান। ধনবাদী অর্থনীতির ভিত্তি যেহেতু আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানে মালিক শ্রমিকের মধ্যে এক রুক্ষ ও কৃত্রিম সম্পর্ক বিরাজমান। সকলেই নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। এর প্রতিক্রিয়ায় কার কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে তাকাবার ফুরসত নেই। কারও।

এই স্বার্থান্ধতার ফলে শ্রমিক ও মালিক আজ দু'টি মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আজ একজন শ্রমিক ততক্ষণই শিল্প-মালিকের কাছ থেকে তার মানবিকতার মর্যাদা পায়, যতক্ষণ কোন মালিক তার কাজ আদায় করে নিতে গিয়ে কোন শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু যখনই এই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে আসে তখনই মালিক মেহনতি শ্রমিক শ্রেণীর উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাতেও দ্বিধা করে না।

আর অন্যদিকে শ্রমিকও মালিকের কাজে ততক্ষণই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে, যতক্ষণ তার জীবিকা কোন মালিকের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই এই বাধ্যবাধকতা থাকে না সেখানেই শ্রমিক কাজে গাফলাতি ও মালিকের বিরুদ্ধে হরতাল এবং ঘেরাও অভিযান করতেও পিছ পা হয় না।

যার পরিণতিতে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এক চিরন্তন দর-কষাকষি বিদ্যমান এবং তাদের পরস্পরে কোন সৌহার্দপূর্ণ ও গঠনমূলক সম্পর্ক কায়েম হয়ে উঠতে পারছে না।

---

* মূলত ইসলামী অর্থনীতিতে মালিকের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। ইসলাম উৎপদন-উপাদানে মালিকের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে না। এখানে আমরা মালিক শব্দটির ব্যবহার শুধু বুঝবার নিমিত্ত করেছি। এখানে মালিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কথিত মালিকের সমার্থক নয়। বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন—ইসলামের অর্থবণ্টন ব্যবস্থা ঃ মওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে ইসলাম এদিকে সবসময়ই লক্ষ্য রেখেছে যে, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক যেন একেবারে শুষ্ক ও কৃত্রিম না হয়ে পড়ে। কারণ এ সর্বজনমান্য কথা যে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোনদিন সুষ্ঠু উৎপাদন আশা করা যেতে পারে না। ফলে, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে না।

ইসলাম তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির ভিত্তিতে এক সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক কায়েম করে—সেখানে একই প্রবাহে বয়ে চলে গঙ্গা-যমুনার দুটি ধারা। ইসলাম উভয়কে এমন কতকগুলি বিধি-নিষেধ দ্বারা আবদ্ধ করে দিয়েছে যাতে তাদের ঐ ব্যবসাগত সম্পর্ক রুক্ষ ও কঠিন না হয়ে হয়েছে ভ্রাতৃমূলক প্রীতির।

শ্রমিকের ব্যাপারে একজন শিল্প মালিকের কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক হযরত শোআইব ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে ব্যাপক অর্থবহ ইঙ্গিত দিয়েছেন। হযরত মূসা আলায়হিস-সালাম অনেক দিন পর্যন্ত শোআইব (আঃ)-এর নিকট গতর খেটে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাঁকে নিয়োগ করার সময়ে তিনি বলেছিলেন,—আমি আপনার উপর অহেতুক কষ্টের বোঝা চাপিয়ে দিতে চাই না। আল্লাহ্র মর্জিতে আপনি আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্য হতে পাবেন।[১১৩]

উক্ত আয়াতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একজন মুসলমান শিল্প মালিকের মনযিলে মাকসূদ টাকা নয়, বরং তাকে সৎকর্মশীল হতে হবে। তাকে সমস্ত কাজ পরকালকে লক্ষ্যে রেখে সততার সঙ্গে করতে হবে। সে মজুরকে শুধু নিজ স্বার্থ চরিতার্থকরণেই খাটিয়ে মারবে না। আর সে ততক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে শ্রমিককে অনর্থক বোঝা থেকে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন নিজের ভিতরে অনুভব কর।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ বক্তব্যটিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যখনই তিনি শ্রমিক মালিকের সম্পর্কের কথা আলোচনা করতেন, তখনই একান্ত আবেগের সঙ্গে বলতেন—যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ্ এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন।[১১৪]

---

১১৩. وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ○

১১৪. বুখারী।

www.pathagar.com

অর্থাৎ এদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের নয়, বরং এরা আর তোমরা—ভাই ভাই। একজন ভাই তার সহোদর থেকে যা কিছু আশা করতে পারে, পেতে পারে, তারাও তোমাদের কাছে তাই আশা করতে পারে। ভাই তার ভাইকে কষ্টে থাকতে দেখলে বসে থাকতে পারে না। তাই—তাদের জন্য কষ্টকর এমন কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। অগত্যা যদি তা' করাতেই হয়, তবে নিজে (স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে) তাদেরকে (সর্বতোভাবে) সাহায্য কর।[১১৫]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার অত্যন্ত তাগিদের সঙ্গে বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের আপনজন ও আত্মীয়-বর্গের সাথে যেমন ব্যবহার করে থাক, তাদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করবে।.....আর মানুষ হিসাবে তারা তোমাদের চেয়ে কোনক্রমে কম নয়। তোমাদের যেমন অন্তর আছে, তাদেরও তেমনি অন্তর রয়েছে। তোমরা কি দেখ না আমি 'যায়দকে' আযাদ করে আমার ফুফাত বোনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বিলালকে মুয়াযযিন মনোনীত করেছি—কেননা সে আমাদের ভাই। তোমরা আরও দেখ যে, আনাস আমার কাছে থাকে। আমি তাকে নিকৃষ্ট মনে করি না। সে কোন কাজ না করলে আমি তাকে বলি না যে কেন তুমি তা' কর নি? আর যদি সে দৈবক্রমে কোন ক্ষতি করে বসে তবুও তার প্রতি আমি রাগ করি না।"[১১৬]

অন্য একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

"তোমরা অধীনস্থদের সহিত সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কোন রকমের কষ্ট দেবে না। তোমরা কি জান না? তাদেরও তোমাদের ন্যায় একটি হৃদয় আছে। ব্যথাদানে তারা দুঃখিত হয় এবং কষ্টবোধ করে। আরাম ও শান্তি প্রদান করলে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন কর না?"[১১৭]

ইসলাম মালিককে সহনশীল হতে শিক্ষা দেয়। ক্ষমাসুন্দর মনোভাব নিয়ে শ্রমিকের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দিতে উৎসাহিত করে। একদিন এক সাহাবী এসে নবী করীমকে জিজ্ঞেস করলেন "হুযুর, চাকর-খাদিমদের অপরাধ কতবার ক্ষমা করব? ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন—

১১৫. বুখারী।
১১৬. বুখারী।
১১৭. কানযুল উম্মাল।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) তা' শুনে চুপ করে রইলেন। ঐ সাহাবী পুনরায় তা-ই জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাপিতদের পরম নির্ভরস্থল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন, "(কত বারের কথা জিজ্ঞেস করছ) "প্রত্যেকদিন সত্তরবার হলেও তাকে ক্ষমা করে দিও।" (এ' যে তোমার ভাই)।[১১৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্য এক জায়গায় বলেন, "মজুর-চাকরদের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্ত্বের লক্ষণ।

মালিকের অভদ্র আচরণকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন অসদাচরণকারী মালিক বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[১১৯]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিজেরও এদের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহঘন সম্পর্ক ছিল। হযরত আনাস (রাঃ) অনেকদিন পর্যন্ত নবী করীমের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমাকে একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন কাজ করতে বলেন। আমি ঐ কাজ করতে রওয়ানা হয়ে গেলাম। কিন্তু পথে ছেলেদের সঙ্গে খেলায় লেগে গেলাম। তখন হঠাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে কোথা হতে এসে ধরে ফেললেন, কিন্তু আমার প্রতি রুষ্টও হন নি এবং আমাকে ভর্ৎসনাও করেন নি।[১২০]

হযরত আনাস (রাঃ) আরো বলেন, "আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এখানে দশ বৎসর পর্যন্ত খেটেছি, তাঁর খিদমত করেছি, কিন্তু তিনি কোনদিন আমাকে ভর্ৎসনা করেন নি। কোনদিন বলেন নি—এটা এভাবে কেন করেছ, ওটা ঐভাবে কেন কর নি।"[১২১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের মানসিক অবস্থার দিকেও খেয়াল রাখতেন। সব সময় তাঁর লক্ষ্য থাকত যাতে তারা বিমর্ষ না হয়ে পড়ে, মন যাতে তাদের ভেঙে না যায়। নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন, সান্ত্বনা দিতেন, আশ্বাসের বাণী শোনাতেন, অভিযোগের প্রতিকার করতেন, তাদের মনোরঞ্জন করতেন।

---

১১৮. তিরমিযী।
১১৯. মাজমাউজ জাওয়ায়ীদ—লিল হায়সামী।
১২০. বুখারী, তিরমিযী।
১২১. আল-আদাবুল মুফরাদ।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত সাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতগার ছিলেন। একদিন কাজের চাপ কিছু বেশী হওয়ায় খানিকটা রাত করেই তিনি মসজিদে নববীর এক কোণে শুতে গেলেন।

ঐ দিন তিনি একটু বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সঙ্গ-সুখের আনন্দদানের উদ্দেশ্যে নিজেই মসজিদে তশরিফ নিয়ে এলেন। হযরত আবু যর ততক্ষণে শুয়ে পড়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে আঙ্গুলির ইশারায় জাগালেন। আর একান্ত সহানুভূতিশীল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন……"আবু যর! ঐ দিন তুমি কি করবে যেদিন তোমাকে এই মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হবে?"

দরবারে নববীতে হযরত আবু যরের অনেকটা অকৃত্রিম সহজ সম্পর্ক ছিল। তিনি সরলভাবে বলে উঠলেন—তলওয়ার খুলে দাঁড়াব। আর যে আমাকে এই শান্তির নীড় থেকে বের করে দিতে চাইবে তার গর্দান উড়িয়ে দেব।"

নবী করীম তখন হাত উঠালেন, দোয়া করলেন, "আল্লাহ্ আবু যরকে তুমি মাফ করে দিও।"

আরও কিছু নসিহতমূলক কথা বলে তিনি উঠে আসলেন।[১২২] হুযুরে পাকের এই দোয়ায় হযরত আবু যরের শ্রান্ত মন যে কতটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল তা' আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজকের এই সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতিতে যদি কোন মালিক শ্রমিকদের খোঁজ-খবর নিজে থেকে নেয়, সুখে-দুঃখে সান্ত্বনার বাণী নিয়ে আসে তবে অতি সহজেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদের ন্যক্কারজনক মানসিকতার দরুন শিল্পমালিক এমন অহমিকায় ভুগছে যে, খোঁজ নেওয়া তো দূরের কথা, তাদেরকে মানুষ বলেই মন থেকে স্বীকার করে নিতে পারছে না। পক্ষান্তরে ইসলাম শিল্পাধিকারীকে তাদেরকে নিজের মতই ভাবতে শিক্ষা দেয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উক্ত কার্যক্রম এবং নির্দেশাবলী সাহাবা-কিরাম তথা মুমিনদের জীবনে অত্যন্ত আশ্চর্য রকমের প্রভাব সৃষ্টি করেছিল এবং শ্রমিক-মালিকের মধ্যে অতুলনীয় হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

১২২. মসনাদে আহমদ।

www.pathagar.com

হযরত আবু যর যখন বেরুতেন লোকেরা দেখত, তিনি যে রকমের কাপড় পড়ে আছেন তেমনি ধরনের পরিচ্ছদ তাঁর খাদেমের অঙ্গেও শোভা পাচ্ছে। অনেকে বলত—হযরত, যে কাপড়টি তাকে দিয়েছেন, এটি যদি আপনিই পরে নিতেন তবে আপনার পোশাকটা পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

তিনি বলতেন—ঠিক-ই বলেছ, কিন্তু আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন—যারা তোমাদের কাজ করছে তারা তোমাদের ভাই। যা নিজে পরবে তা-ই তোমাদেরকে পরাবে। আর যা নিজে খাবে, তাই তাদেরকে খাওয়াবে।।[১২৩]

শুধু আবু যর একাই নন, উবাদা ইবনে অলীদ বর্ণনা করেন ঃ

আমি এবং আমার পিতা বিদ্যার্জন মানসে মদীনায় গেলাম। আবু ইয়াসর নামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবীর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমরা দেখলাম তাঁর সঙ্গে একজন খাদেমও আছেন। তিনি একটি চাদর ও মুআফরী জাতীয় কাপড় পরে আছেন। আর তার খাদেমও তাই পরে রয়েছেন। বললাম —হযরত! আপনার চাদরটি তাকে দিয়ে তার মুআফরীটি আপনি নিয়ে নিলে কিংবা তাকে আপনার মুআফরীটি দিয়ে দিলে উভয়েরই এক একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছদ হয়ে যেত।

তখন আবু ইয়াসর মাথায় হাত রেখে বললেন—আল্লাহ্ এতেই বরকত দিন। শুনে রাখ, আমার এ চোখ দেখেছে, এ কান শুনেছে আর স্মৃতি তা' সংরক্ষণ করে রেখেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—নিজে যা পরবে, তাই তাদেরকে পরাবে। আর নিজে যা খাবে, তাই তাদেরকে খাওয়াবে।"[১২৪]

সাহাবা-ই-কিরাম যেন এর বিপরীত ভাবতেই পারতেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) তার খাদেমের জন্য গোশ্ত তৈরী করে রেখে বসে থাকতেন। সে বাজার থেকে আসলে তাকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন। লোকেরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন,—আমি আমার দিল সাফ রাখার জন্য এমন করি।"[১২৫]

---

১২৩. আহমদ, আল-আদাবুল মুফরাদ।

১২৪. আল-আদাবুল মুফরাদ।

১২৫. আল-আদাবুল মুফরাদ।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ) একবার বলেছিলেন—আল্লাহ্ ঐ জাতিকে লানত করুন, যারা নিজেদের খাদেমদের নিয়ে এক সঙ্গে খেতে ঘৃণাবোধ করে।"

এ কথা শুনে হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র 'কসম' আমরা এ ঘৃণাবোধ করি না। অধিকন্তু নিজেদের উপরও আমরা তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি।"[১২৬]

মোটকথা, ইসলাম মালিককে সহনশীল হৃদয়বান এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হতে শিক্ষা দেয়। মালিক নিজের মনের মধ্যে মজুরকে কোন প্রকার শোষণের অভিপ্রায়ও রাখতে পারে না, স্বাস্থ্যহানিকর ও তার সাধ্যাতীত কোন কাজে তাকে নির্দয়ভাবে নিযুক্ত করতে পারে না, বরং সে মজুরের কষ্টকে নিজের কষ্ট বলে মনে করবে। সমব্যথী হয়ে তার কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকবে, আনন্দে সঙ্গী হবে; তাকে আত্মীয়-তার স্নিগ্ধ পরিবেশে রাখবে যাতে সে কোন রকমের হৃদ্যতার অভাব অনুভব না করে। সর্বোপরি একজন মজুরকে সে নিজের সহোদরের মর্যাদায় রাখবে—যার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর কিছুই হতে পারে না।

এ সুনিশ্চিত কথা যে, ঐ রকমের মনোভাব নিয়ে, যদি কোন মালিক শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করে, তবে আশ্চর্য রকমভাবে সব কিছুরই সমাধান হয়ে যেতে পারে এবং আজকের মত বঞ্চনার আগুন শ্রমিকদের মনে আর ধিকিধিকি করে জ্বলবে না।

---

১২৬. আল-আদাবুল মুফরাদ।

www.pathagar.com

শ্রমিকদের গুণাবলী

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ-ব্যবস্থা যা' পৃথিবীর সমস্ত রকমের সমস্যার সমাধান দেয়। এ কেবল শ্রমিদেরকে মালিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষার জিকির তুলে তাদেরকে দায়িত্বহীন করে তুলতে আসে নি।

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হল এক সামঞ্জস্যপূর্ণ পৃথিবী গঠন করা; যেখানে সকলেই আপন আপন ন্যায়ানুগ অধিকার সংরক্ষিত রেখে নিরাপদে তা ভোগ করতে পারে। ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সে এক সুসংহত অর্থ-ব্যবস্থার সন্ধান দেয় এবং কার্যকরীভাবে একে প্রতিষ্ঠিত করে।

তাই ইসলাম যেভাবে মালিকদেরকে অনেক প্রকার দায়িত্ব ও বিধি-নিষেধের অধীন রেখেছে তেমনি মজুরদের উপরও আবশ্যক ন্যায়নীতি আরোপ করেছে। তাদেরকে লাগামহীন হওয়ার সুযোগ দেয় নি। কারণ আমরা জানি, সম্পর্ক কোনদিনই একতরফাভাবে কায়েম হতে পারে না—এতে উভয়েরই সদিচ্ছারই প্রয়োজন হয়। পারস্পরিক সমঝোতা ব্যতিরেকে এ কোনদিনই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না।

তাই ইসলাম শ্রমিক হিসাবে তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ দেখতে চায় যেগুলির সাহায্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উৎকর্ষের হয়ে ওঠে।

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক মালিকের কাজের দায়িত্ব নিজের পছন্দানুযায়ী আপন কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যায়, যা শুধু পেট চালাবার নিমিত্তই সে করবে না; করবে আখিরাতের সফলতার জন্যে।

তাকে কার্যক্ষম ও শক্তিশালী হতে হবে; সর্বোপরি তাকে বিশ্বাসী, আমানতদার এবং নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ সর্বোত্তম শ্রমিক সে-ই, যে শক্তিশালী ও আমানতদার (দায়িত্বশীল) হয়।[১২]

---

১২. إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

www.pathagar.com

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই।"[১২৮]

মালিকের যে কাজ তার উপর ন্যস্ত আছে, সে-ই এর সংরক্ষণ করবে, হিফাজত করবে। সুতরাং তার উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে ঐ কাজ বিজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালন করা। আল্লাহ্ পাক ইউসুফ আলায়হিস সালামের একটি ঘটনার দিকে ইশারা করে কথাটার তাৎপর্য বুঝিয়েছেন। তৎকালীন মিসর সম্রাট স্বপ্নবৃত্তান্ত অনুযায়ী সাম্রাজ্যে এক দারুণ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি অনুভব করছিলেন। তখন সম্রাট ইউসুফ আলায়হিস সালামকে কারাগার হতে মুক্ত করে আনেন। ঐ সময়ে তিনি সম্রাটের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হলে তাঁকে বলেছিলেন, আমাকে কোষাগারের দায়িত্ব দেয়া হউক। কারণ আমি উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং বিজ্ঞও।[১২৯]

অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করার ক্ষমতা রাখি। তাই আমাকে তা দেওয়া যেতে পারে।

শ্রমিক যে কাজের যিম্মাদারী নেবে, সে কাজ সম্পর্কে তার জ্ঞান ও শিক্ষা থাকা উচিত। তাকে শারীরিক দিক দিয়েও ঐ কাজের উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ শারীরিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকেই তাকে কার্যক্ষম হতে হবে। কারণ আমরা জানি, শুধু শারীরিক বা কেবল জ্ঞানগত শক্তি দিয়ে কোন কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। কার্যোপযোগী জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউ-ই কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, ঠিক তেমনি শারীরিক সুস্থতা ও উপযুক্ততা না থাকলে তার দ্বারাও কিছু হতে পারে না।

তালূতের মত একজন আর্থিক সঙ্গতিহীন ব্যক্তিকে যখন বনি ইসরাঈলদের হিফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হল, তখন সকলেই অভিযোগ করতে আরম্ভ করল—এ অনুপযুক্ত। কারণ তার কোন আর্থিক সঙ্গতি নেই। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর নিযুক্তির যৌক্তিকতা বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছিলেন, জ্ঞান ও শারীরিক শক্তি উভয় দিক থেকেই সে অগ্রণী।"[১৩০]

ইসলাম কাজের গাফলতিকে কোনমতেই বরদাশত করতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এ এক মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ পাক

---

১২৮. মিশকাত।

১২৯. انى حفيظ عليم ٥

১৩০. زاده بسطة فى العلم والجسم ٥

www.pathagar.com

বলেন, এদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে, যারা তাৎফীফ অর্থাৎ মাপে কমবেশ করে। নিজের হক নেবার সময় পুরোপুরিভাবে আদায় করে নেয়, কিন্তু অন্যকে মেপে দিতে গেলেই কম দেয়।"[১৩১]

ফুকাহা-ই-উম্মতের ভাষ্যানুযায়ী এ আয়াতের মধ্যে 'তাৎফীফ' অর্থাৎ মাপে কমবেশ করার ভাবার্থে ঐ সব মজদুরও শামিল যারা নির্ধারিত পারিশ্রমিক পুরোপুরি উসুল করেও কাজে গাফলতি প্রদর্শন করে। আর যে সময়টা মালিককে দিয়ে দিয়েছে তা তার মর্যির খেলাপ অন্য সব ক্রিয়া-কর্মে কাটিয়ে দেয়।

যে কাজ যেভাবে করা উচিত, সে কাজ ঠিক তেমনিভাবে আদায় করা তার জন্য অপরিহার্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান—যখন কোন বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ্ চান যে, সে তার কাজে 'ইতকান' পয়দা করুক। অর্থাৎ যা যেভাবে করা দরকার- ঠিক সেইভাবে তাকে তা আঞ্জাম দিতে হবে।[১৩২]

ইসলাম একজন শ্রমিককে এই নির্দেশই দেয় যে, মালিকের যে কাজের দায়িত্ব সে নিজের পছন্দানুযায়ী গ্রহণ করে নিয়েছে, তা এখন তার নিজের কাজ হিসেবে গণ্য হয়ে পড়েছে। তার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে স্বতস্ফূর্তভাবে ও মনোযোগ সহকারে একে আঞ্জাম দেওয়া। নইলে সে তার পরকালীন সফলতা লাভ করতে পারবে না যা তার শেষ গন্তব্যস্থল—আখিরী কিয়ামগাহ্।

সৎকর্মশীল একজন শ্রমিক যে আল্লাহ্ এবং মালিকের হক আদায় করতে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। এমন কি তার মালিক থেকেও বেশী। এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান তিন প্রকারের লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। তাদের একজন সে-ই যে নিজের মালিকের হকও আদায় করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র হকও আদায় করে।[১৩৩]

তিনি আরও ফরমান, যে অধীনস্থ খাদেম আল্লাহ এবং তার মালিকের অনুগত থাকে ফরমাবরদারী করে, তাকে মালিকের সত্তর বৎসর পূর্বেই

১৩১. ওয়াই লুল্লিল মুতাফ্ফিফিনাল্লাযিনা ইযাক্তালূ আলান্নাসি ইয়াস্তাওফুন। ওয়া ইযা কালূহুম আওওয়া যানূহুম ইউখ্সিরূন

১৩২. কানযুল উম্মাল, হায়সামী।

১৩৩. মিশকাত।

www.pathagar.com

বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। মালিক তখন জিজ্ঞেস করবে,—আল্লাহ! এ-ত আমারই একজন অনুগত খাদিম ছিল; তবুও এর এত মর্যাদা কেন?

আল্লাহ্‌পাক বলবেন—"আমি তার কাজের প্রতিফল দিয়েছি। আর তোমাকেও তোমার কাজের প্রতিদান দিয়েছি।"[১৩৪]

১৩৪. তাবরানী, হায়সামী।

www.pathagar.com

ইসলামে শ্রম বিনিয়োগের পন্থাসমূহ

শ্রমিক যদি তার শ্রম বিনিয়োগ করার পর্যাপ্ত সুযোগ না পায় তবে সে বেকারত্বের এক অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে সমসাময়িক অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সারা দেশে হাহাকার পড়ে যায়। যুব শক্তি তখন তাদের কর্মক্ষমতা অহিতকর ও অন্যায় সব রাহাজানি এবং খুনখারাবিতে ব্যবহার করতে শুরু করে দেয়। অরাজকতা সমস্ত দেশকে গ্রাস করে ফেলে।

তাই সকল কল্যাণমুখী রাষ্ট্রেরই কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্র নির্মাণ করা এক পবিত্রতম মৌলিক দায়িত্ব। একে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম হল, আল্লাহ্‌র এক পবিত্র আমানত। একে ব্যয় করে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করার জন্যই মানুষকে তিনি তা' দিয়েছেন। তাই অন্যায় গাফলতি প্রদর্শন করে, একে ধ্বংস করা বা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য করা এক অসহনীয় অপরাধ, মারাত্মক রকমের খিয়ানত। আর যে ব্যক্তি আমানতের খিয়ানত করে সে ইসলামের দৃষ্টিতে 'মুনাফিক' বা জঘন্য এক প্রবঞ্চক বলে পরিগণিত। তাকে আল্লাহ্‌পাক এমনি এমনি ছেড়ে দেবেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান, "কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে এক পা-ও অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না। সেগুলির মধ্যে এও একটি—"কর্মক্ষমতা যুক্ত তোমার যৌবন মদমত্ততা কোন ক্রিয়া-কর্মে ব্যয় করেছ, কেমন করে তা' খাটিয়েছ।"[১৩৫]

যা'হোক শ্রম বিনিয়োগ পন্থা নির্ধারণ একটি মৌলিক সমস্যা। এ ছাড়া কোন দেশের অর্থনীতিই সুসংহত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না।

১৩৫। মিশ্‌কাত, তিরমিযী।

www.pathagar.com

এই কারণেই ইসলাম এদিকে গভীর দৃষ্টি দিয়েছে। এর জন্য মৌলিক নীতিমালা নিরূপণ করেছে।[১৩৬]

ইসলাম শ্রমিকের সামনে অফুরন্ত সুযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। উপার্জন ক্ষেত্রের অন্তহীন ময়দান তার সামনে তুলে ধরেছে। সম্পদ উপার্জনের প্রাথমিক উৎসসমূহে সে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ইজারাদারী সহ্য করে নি, বরং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে ঐগুলি হতে উপকৃত হওয়ার সমান সুযোগ দিয়েছে। উপার্জনের মধ্যে সকলকেই সমান অধিকার দিয়েছে। এই সংশ্রবেই আল্লাহ্‌পাক ফরমান—"চারদিনের ভিতরই তাদের উপজীবিকা—এর মধ্যে (ভূমি) সুনির্ধারিত ভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে সমস্ত প্রার্থীর জন্য (উপার্জন হিসেবে) সমানাধিকার রয়েছে।"[১৩৭]

প্রাকৃতিক সম্পদ, খনি, বন, মালিকবিহীন পরিত্যক্ত ভূমি, জলজ শিকার, স্বাভাবিকভাবে অঙ্কুরিত ঘাস, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি হল সম্পদ অর্জনের প্রাথমিক উৎসস্থল। এগুলিকে বিশেষ এক শ্রেণীর মালিকানাধীন করে দেওয়ার ফলেই আজকের অর্থনীতি এক জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। ইজারাদার এবং পুঁজিপতিদের থলি দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে আর অসংখ্য সাধারণ মেহনতি মানুষ তাদের শ্রম বিনিয়োগ করার কোন সুযোগ না পেয়ে সম্বলহীন হয়ে বেকার হতে বাধ্য হয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষের সামনে আজ শ্রম বিনেয়োগ স্থলগুলি দিনের পর দিন সংকুচিত হয়ে আসছে। পুঁজিপতিদের অনুগ্রহ ছাড়া বেঁচে থাকার তাদের কোন সুযোগই নেই; শিল্পপতিদের অসহনীয় আবেষ্টনীর ভিতর তারা দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছে। বাঁচবার আর কোন পথই খুঁজে পাচ্ছে না। তাই তারা অন্ধের

১৩৬. এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে একটি কথা বুঝে নেওয়া দরকার—শ্রম কি? কারণ, এ না জানা থাকলে তার বিনিয়োগ পন্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যেতে পারে না ইসলামী অর্থনীতির প্রেক্ষিতে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার মেহনতই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের পরিভাষায় শ্রমিক তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কোন কিছুর বিনিময়ে নিজের শ্রমকে বিক্রি করে। আর মালিক তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কারো নিকট হতে বিনিময়ের মাধ্যমে ফায়দা ভোগ করে।

১৩৭. وقدر فيها اقواتها فى اربعة ايام سواء للسائلين ○

www.pathagar.com

মত এদিক ওদিক হাতড়িয়ে মরছে। ছোট অবোধ শিশু যেভাবে রাগের মাথায় হাত-পা ছুড়তে থাকে, কাছে যা পায় তা-ই ভেঙে তছনছ করে. তেমনি আজকে সাধারণজন, শ্রমিক জনতা পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে না পেরে নিজেদের আয়ের উৎস কলকব্জা ও যন্ত্রপাতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, হরতাল করে সবকিছু চুরমার করে ফেলে।

কিন্তু শোষকদের আবেষ্টনী তবুও দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়েই চলেছে, কোথাও পুঁজিবাদের নামে আর কোথাও বা সমাজতন্ত্রের গালভরা বুলির আড়ালে।

পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র এমন এক জীবন-বিধান যা মানুষকে নিরাপত্তা ও শান্তির রাস্তা দেখিয়েছে। সে শোষণের সব রকম মাধ্যমের-ই মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। পুঁজিপতি যে ভিতের উপর দাঁড়িয়ে মেহনতি মানুষের উপর অত্যাচার চালায় তা-ই সমূলে উৎখাত করে দিয়েছে।

ইসলাম সম্পদ অর্জনের উপরোক্ত প্রাথমিক উৎসসমূহ হতে সমাজের প্রতিটি সদস্যকে নিজ নিজ মেহনত ও শ্রম অনুযায়ী ফায়দা উঠাবার সমান সুযোগ দিয়েছে। এখানে কারও কোন রকমের ঠিকাদারী বরদাশত করে নি। একবার এক সাহাবীর আবেদনক্রমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছু পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত হিসাবে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন এ'তে লবণের খনি রয়েছে, তখন তিনি তা' তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।[১৩৮]

এরই প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রঃ) বলেন ঃ

> এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মা'দনে জাহের বা প্রকাশোন্মুখ খনি, যা ভূমির অন্যান্য কোষের সঙ্গে একেবারে মিশ্রিত নয় এবং অতি সহজেই যেগুলি উত্তোলন করা যায়, যেমন লবণ, কেরোসিন ইত্যাদি—এসব বিশেষ কাউকে জায়গীর হিসাবে দিয়ে দিলে তাদের (নাগরিকদের) প্রয়োজন মিটানোর পথ অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। তাই ঐগুলি কাউকে জায়গীর হিসাবে দেওয়া যেতে পারে না।[১৩৯]

---

১৩৮. কিতাবুল আমওয়াল—লি আবী উবাইদ।

১৩৯. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

www.pathagar.com

আর তাই ইসলামী আইনশাস্ত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে,—যে সমস্ত খনিজ পদার্থের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান নাগরিকদের স্বার্থ জড়িত এবং তারা ঐগুলির প্রয়োজন হতে দূরে সরে থাকতে পারে না, ঐ সমস্ত পদার্থ কাউকে জায়গীর হিসাবে দিয়ে দেওয়ার অধিকার সরকারেরও নেই।[১৪০]

পানি, ঘাস, আগুন ইত্যাদিও কারো ব্যক্তি-মালিকানায় আসতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিনটি জিনিসের মধ্যে সকলই সমান—পানি, ঘাস আর আগুন।[১৪১]

একবার ইবনে উমর (রাঃ)-এর গোলাম তাঁর কাছে চিঠি লেখেন ঃ

> আপনার ক্ষেতের পানি সেচ কার্য সমাধা হওয়ার পর অবশিষ্ট পানি অন্য একজনকে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে দেওয়া যায়। এখন আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) জওয়াবে লিখলেন ঃ

> তোমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছি। কিন্তু আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জবানে শুনেছি—যে ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি, ঘাস ইত্যাদি ফিরায়ে রাখবে, অন্যকে উপকৃত হতে দেবে না, তাকে মারাত্মক শাস্তি দেওয়া হবে। তাই আমার বাগানের সেচ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে পার্শ্ববর্তী ভূমি-মালিকদিগকেও অতিরিক্ত পানি হতে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিও।[১৪২]

যে সমস্ত ভূমি, দ্রব্যসামগ্রী মানুষের প্রয়োজনীয়—যেমন আবাদির বাইরের তৃণক্ষেত্র, আশেপাশের বনভূমি যা' থেকে জনসাধারণ নিজেদের জ্বালানি ইত্যাদি সংগ্রহ করে, ঐ সমস্ত ভূমি কেউ আবাদ করে নিজের মালিকানায় আনতে পারে না বা সরকার কারও মালিকানায় তা' দিতে পারে না।

এই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ইমাম যয়লয়ী (রাঃ) বলেন ঃ

> আবাদির আশেপাশের ভূমি হতে লোকেরা সাধারণত উপকৃত হয়। এইগুলিকে নিজেদের গবাদি পশুর চারণভূমি হিসাবে

১৪০. দুররে মুখতার।
১৪১. মিশকাত, মবসূত।
১৪২. কিতাবুল খারাজ, কিতাবুল আমওয়াল।

www.pathagar.com

তারা ব্যবহার করে, প্রয়োজনীয় ঘাস যোগাড় করে। এইগুলির প্রয়োজনীয়তাকে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে না। তাই এগুলি মাওয়াত নয়। অর্থাৎ আবাদ করে কারো মালিকানায় আনা যাবে না।[১৪৩]

বুনো পাখীর যেমন কেউ-ই মালিক হতে পারে না, যে-ই ধরতে পারে সে-ই এর মালিক হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি নদ-নদীর মৎস্যের মালিক কেউ নির্দিষ্ট করে হতে পারবে না, এ সর্বসাধারণের। তাই সরকার এই প্রকারের জলাভূমি কাউকে ইজারা হিসাবে দিতে পারে না। এই সম্পর্কে প্রখ্যাত মনীষী সাহেবে এনায়াহ লিখেন ঃ

> সরকারের অধিকার নেই কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত জিনিসের মালিক বানিয়ে দেওয়ার। যদি কাউকে মালিক বানিয়েও দেয়, তবু সে মালিক হবে না।

মাছ ছাড়াও সমুদ্র এবং নদী-নালার অন্যান্য প্রাণী, জীবজন্তু ও দ্রব্যাদির হুকুমও তাই। ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে সামুদ্রিক ও জলজ জীবজন্তু এবং দ্রব্যাদির যত দামই হোক না কেন, সমস্তেরই হুকুম মৎস্যের ন্যায়। অর্থাৎ ঐগুলিতে সকলেরই সমান অধিকার। সরকার এতে কোন রকমের কর ধার্য করতে পারবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেন ঃ

> ইমাম আবু হানীফা এবং ইবনে আবি লায়লার অভিমত এই যে, সামুদ্রিক জীবজন্তু ও দ্রব্যাদির বেলায় কোনরূপ সরকারী মাশুল লাগানো যাবে না।

কিন্তু তিনি নিজে হযরত উমর (রাঃ)-এর একটি বক্তব্যের উপর নির্ভর করে বলেন—"সামুদ্রিক দ্রব্যাদি যা অলংকার এবং সুগন্ধিরূপে ব্যবহৃত হয় এইগুলিতে আহরিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ সরকারী বায়তুল মালে দিতে হবে।[১৪৪]

মোটকথা, পানি, আগুন, খনি, তৃণভূমি, বন, বৈধভূমি, রাস্তা ইত্যাদির কেউ ব্যক্তিগতভাবে মালিক হতে পারে না। সমস্ত জনসাধারণ এগুলি থেকে নিজেদের প্রয়োজন ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী সমানভাবে উপকৃত হওয়ার অধিকারী।

এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি, এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম শ্রম বিনিয়োগের স্থলগুলো এবং সম্পদ উপার্জনে প্রাথমিক

---

১৪৩. ইসলামী মুআশিয়াত—আল্লামা গিলানী

১৪৪. কিতাবুল খারাজ।

www.pathagar.com

উৎসসমূহকে সকলের জন্যই ব্যাপক করতে চায়। বিশেষ কাউকে সুযোগ দিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে রাখা, এ জুলুম ইসলাম কখনো সহ্য করতে পারে না।

ইসলাম শ্রম বিনিয়োগ স্থলের এক বিপুল দিগন্ত খুলে দিয়েছে। যেখানে মেহনতি জনতা অসহায় হয়ে পড়ে না বরং তাদের চোখের তারায় জীবনের আশা চিক্ চিক্ করে ওঠে, তারা বেঁচে থাকার তাগিদ পায়। আর এই সুষ্ঠু কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতেই আমরা দেখি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোনদিন বেকারত্বের অভিশাপ নেমে আসে নি।

শ্রম বিনিয়োগের সমস্ত দিকের ব্যাপক আলোচনা করতে গেলে বিস্তৃত পরিধির প্রয়োজন। তাই আমরা এক্ষণে মোটামুটি এমন কতকগুলি শ্রম বিনিয়োগ পন্থার আলোচনা করব, যেগুলিকে ইসলাম সমর্থন করে। ভরসা রাখি, এর সাহায্যে ইসলামের ইনসাফভিত্তিক সুব্যবস্থাগুলো আমাদের সামনে ঔজ্জ্বল্য নিয়ে ভেসে উঠবে।

www.pathagar.com

মুজারাবাত

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম বিনিয়োগের অন্যতম পন্থা হল মুজারাবাত। এই পন্থায় একজন তার পুঁজি বিনিয়োগ করে অন্যজন আপন শ্রম বা মেহনত দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং উভয়েই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয় এবং ব্যবসার ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে।

অর্থাৎ পুঁজিপতি শুধু অর্থ ও পুঁজির যোগান দিয়েছে বলেই সে সমস্ত মুনাফার মালিক হয়ে যাবে আর মেহনতি জন ভিত্তিহীনতার কারণে জীবন ভর-ই পুঁজি মালিকের দয়ার উপর নির্ভর করে গতর খাটিয়ে চাকরি করে কাটাবে ইসলাম এ চায় না।

তাই ইসলাম এই পন্থার মাধ্যমে শ্রমিককেও লাভের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। শ্রমিকের হাতে আর্থিক পুঁজি নেই; ইসলাম তাকে বলেছে তোমার শ্রমই তোমার শ্রেষ্ঠ পুঁজি। একে খাটিয়েই পুঁজি মালিকের সমপর্যায়ের হতে পার।

আর এই হিসাবে শ্রমিক শুধু শ্রমিক নয়, সে শিল্প-মালিকও বটে। পুঁজির অধিকারী পুঁজির যোগান দিয়ে মালিক হয়েছে, আর শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রম বিনিয়োগ করে এর মালিক হয়েছে।

খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও নবুয়তের পূর্বে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ব্যবসায়ে এই পন্থায়-ই আপনার শ্রম নিয়োগ করেছিলেন।[১৪৫]

প্রাচ্যের প্রখ্যাত মনীষী শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রঃ) এই সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বলেন ঃ

> পারস্পরিক সহযোগিতার যে কতগুলি পন্থা রয়েছে সেগুলির মধ্যে মুজারাবাত অন্যতম। এতে পুঁজি একজনের এবং মেহনত অন্য আর একজনের। আর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে উভয়ই এতে মুনাফার মালিক হয়।[১৪৬]

---

১৪৫. আল্ বিদায়া ওয়ান নিহায়া—লিল হাফেজ ইবনে কাসীর।

১৪৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা—দ্বিতীয় খন্ড।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব 'সুআইদিয়াৎ'এ উক্ত পন্হার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে ঃ

> মুজারাবাত মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজনের খাতিরেই বৈধ রাখা হয়েছে। কারণ সমাজে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি রয়েছেন যারা পুঁজি খাটাতে তেমন দক্ষ নন। কার্যকরী এবং লাভজনক পন্হায় এরা অর্থ বিনিয়োগ করতে জানেন না। আবার এমন বিত্তহীন লোকও রয়েছেন যারা অত্যন্ত সুবিবেচক ও দক্ষ কর্মকর্তা হিসাবে পরিগণিত হতে পারেন, কিন্তু শুধু পুঁজির অভাবের দরুন তারা নিজেদের কর্মদক্ষতা সপ্রমাণিত করতে পারছেন না।
>
> তাই ইসলাম উক্ত পন্হাকে বৈধ রেখেছে যাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত হয়ে সাপের কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে না থাকে বরং বাজারে খাটতে থাকে ও সমাজের প্রতিটি স্তরে আবর্তিত হতে থাকে। আর এমনিভাবে পুঁজিপতি ও পুঁজিহীন উভয়ই এর ফল ভোগ করতে পারে।
>
> একে মঙ্গলজনক দেখেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বৈধ রেখেছেন। সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) ব্যাপকভাবে এর উপর আমল করে গিয়েছেন।

এই পন্হায় শ্রমিককেই অধিকতর সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকের উপর যত প্রকার শোষণের সম্ভাবনা ছিল সবগুলিরই দরওয়াজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে পুঁজির মালিক লাভের একটা নির্দিষ্ট অংক ঠিক করে নিয়ে আপনার হিস্যা নিশ্চিত করে নিতে পারত। এতে শ্রমিকের হিস্যা সংশয়পূর্ণ থাকত। তাই ইসলাম এ সব কিছু নাজায়েয করে দিয়েছে এবং ভগ্নাংশের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে লাভের হিস্যা বাটোয়ারার নির্দেশ দিয়েছে। পুঁজিপতি যদি আপনার অংশ নির্দিষ্ট করে নিতে চায় আর শ্রমিক অর্থাভাবের দরুন বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, আপন সম্মতিতেও যদি ঐ রকম শ্রম বিনিয়োগে রাযী হয়ে যায় তবুও ইসলাম ঐ চুক্তিকে স্বীকৃতি দেয় না। কারণ এতে শ্রমিকের আপন হিস্যা হতে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। এর কারণ ব্যবসায় হতে সেই পরিমাণ টাকা আসতে পারে মালিক নিজের জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছে; ফলে শ্রমিক কিছুই পাবে না। কিন্তু ইসলামী

www.pathagar.com

নীতি অনুযায়ী এমন অবস্থায়ও শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরি পাবে, মুনাফা হোক বা না হোক।[১৪৭]

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী মুজারাবাতের পন্থায় পুঁজি-মালিকের বিনিয়োজিত অর্থ ও জিনিসপত্র শ্রমিকের হাতে আমানত হিসাবে থাকে। তাই সে অর্থ যদি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শ্রমিক নষ্ট করে না কিন্তু তার সতর্কতা সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে যায় তবে তাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১৪৮]

এই কারণেই ইসলামে পুঁজিপতির অর্থ সাধারণ মেহনতিজনদের জন্য অভিশাপ ডেকে আনে না, বরং এখানে এ দ্বারা পারস্পরিক সহযোগিতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের এক বিরাট দরওয়াজা খুলে যায়। পুঁজিহীন ব্যক্তির পরিচালনা ও সংগঠন শক্তি তার বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যম বিফলে নষ্ট না হয়ে সমাজের এক লাভজনক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে পুঁজি-কেন্দ্রীভূত হয়ে সাধারণ জনের প্রয়োজনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভিশাপ হতে সমাজ মুক্তি লাভ করতে পারে এবং সমাজজীবনে কোন বেকার-বুভুক্ষু জনের সৃষ্টি হয় না। আর এরই মাধ্যমে অর্থ বিকেন্দ্রিক হয়ে সমাজের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিণামে ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত, শোষণমূলক মানসিকতাসম্পন্ন পুঁজিপতির জন্ম হওয়ার কোন সুযোগই থাকে না।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী আমানতদার এবং বুদ্ধিমত্তার অধিকারী একজন মেহনতীর প্রয়োজন পূরণে মুজারাবাতের চেয়েও শ্রেয়, সম্মানজনক এবং উৎসাহব্যঞ্জক আর কোন পন্থাই হতে পারে না।

ইসলামী অর্থনীতিবিদ আল্লামা হিফজুর রহমান সাহেব বলেন—বড় বড় পুঁজিপতিগণের ব্যবসায়গত অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা থাকা সত্ত্বেও সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের খাতিরে তাদের পুঁজি হতে একটি অংশ মুজারাবাতের ভিত্তিতে খাটানো অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব।[১৪৯]

আমরা ভাবতে পারি আজ যদি দেশে সামগ্রিকভাবে এই পন্থা কার্যকরী করা যায় তবে কত তাড়াতাড়ি আমাদের দেশ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

---

১৪৭. হিদায়া।
১৪৮. হিদায়া।
১৪৯. ইসলামকা ইক্‌তিসাদী নিজাম।

www.pathagar.com

মুজারাআত

দ্বিতীয় শ্রম বিনিয়োগ পন্থা হলো 'মুজারাআত'। এ ভূমিতে বিনিয়োজিত মুজারাবাতের মতই এক প্রকার শ্রম। শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, মুজারাবাত হয় ব্যবসার মধ্যে, 'মুজারাআত' হয় কৃষি-ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মুজারাবাতের পন্থায় যেমন একজন পুঁজির যোগান দেয় আর অন্যজন শ্রম বিনিয়োগ করে এবং উভয়ই লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে, তেমনি মুজারাআতের মধ্যেও জমির মালিক জমির যোগান দেয় আর অন্যজন তার শ্রম বিনিয়োগ করে। উৎপন্ন ফসলে উভয়ই আপন আপন হিস্যানুযায়ী অংশীদার হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেন—যেমনিভাবে 'মুজারাবাতের' পন্থায় শ্রম বিনিয়োগ করা বৈধ, তেমনিভাবে আমার মতে মুজারাআত-এও বৈধ। এতে একজন ভূমির যোগান দেয় ও অন্যজন তার শ্রম বিনিয়োগ করে। আর লাভে অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলে উভয়ই অংশীদার হয়।[১৫০]

ফুকাহা-ই-কিরাম উক্ত পন্থাকে শ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিখ্যাত ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ্ ইমাম সারাখ্সী বলেন, "যাঁরা মুজারাআত বৈধ বলে ধারণা রাখেন তাঁদের কাছে এ এক প্রকার ইজারা হিসাবে পরিগণিত।"

ইসলামী ফিক্হর নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বাদায়ে ওয়া সানায়ে'তে এই সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে বলা হয়েছে 'মুজারাআত' বা উৎপন্ন ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া, ইজারা ও 'শিরক' এতদউভয়েরই সমষ্টি। প্রথমে এ চুক্তি ইজারা হিসাবে সংঘটিত হয় এবং পরে গিয়ে অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

হিদায়ায় উক্ত পন্থার যৌক্তিকতা ও প্রামাণিকতা বর্ণনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে—রসূলে পাক (স.) নিজে খায়বরবাসীদের সঙ্গে এমনি পন্থায় মুয়ামেলা করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) রিওয়ায়েত করেন—খায়বর বিজিত হওয়ার পর তথাকার অধিবাসী য়াহুদীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দরখাস্ত করল—"হযরত! অর্ধেক ফসলের ভিত্তিতে কৃষি-ক্ষেতগুলি আমাদের কাছেই থাকতে

---

১৫০. কিতাবুল খারাজ।

www.pathagar.com

দিন।" তখন নবী করীম (স.) বললেন—"তোমাদের কাছে তা থাকতে দিব, যতদিন আমাদের ভাল বলে মনে হবে।[১৫১]

সমাজে এমনও হতে দেখা যায় যে, ভূমির মালিক ঠিকমত জমি চাষ করতে পারে না। ফলে অনেক কৃষিজমি অকর্ষিত থেকে যায়। আর অন্যদিকে ভাল কার্যক্ষম লোক ভূমিহীনতার দরুন দক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কিছু করার সুযোগ পায় না। এতে সমাজ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যেতে পারে। তাই এই পন্থাকে বৈধ রাখা হয়েছে—যাতে উভয়েরই সুবিধা হয়।"

সাহাবা-ই-কিরামও ব্যাপকভাবে উক্ত পন্থায় শ্রম বিনিয়োগ করে গিয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন, "মদীনায় এমন কোন ঘর ছিল বলে সন্দেহ আছে যারা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ এবম্বিধ হিস্যার ভিত্তিতে যমীন বন্দোবস্ত না দিয়েছেন।[১৫২]

হযরত আলী, সাদ, ইবনে মাসঊদ, আবূ বকর, উমর, কাসিম, উরওয়া (রাঃ), উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ), ইবনে শিরীন (রাঃ) সকলেই ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যমীন বন্দোবস্ত দিয়েছেন।[১৫৩]

প্রাক-ইসলাম যুগে কৃষি-শ্রমিকের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হত। ভূমি মালিকগণ তাদেরকে খরিদা গোলামের মতই মনে করত। ভূমি মালিকগণ নিজেদের অংশ নির্দিষ্ট করে রেখে দিয়ে কৃষি-শ্রমিকদিগকে উৎপন্ন না হলেও ভূমি মালিককে নির্দিষ্ট হারে ফসল দিতে হত। আবার অনেক সময়ে যমীনের উর্বরা অংশটির ফসল ভূমি মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। আর অনুর্বরা অংশটি কৃষি-শ্রমিকের ভাগে থাকত। তারা বলত, 'এদিক দিয়ে (উর্বরা অংশ) যা হয় সব আমার আর ওদিক দিয়ে (অনুর্বরা অংশ) যা হয় তা তোমার। এতে কৃষি-শ্রমিকের বঞ্চিত হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকত। কারণ অনেক সময়ই অনুর্বরা অংশে প্রায় কিছুই জন্মাত না। এমনি করেই তার সারাটি বছরের হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনি একেবারে বৃথা যেত।

এমনভাবে দিন-দিন কৃষি-শ্রমিকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ইসলাম মানবতার মুক্তির বাণী নিয়ে আসে এবং জুলুমের সকল দ্বার একেবারে বন্ধ করে দেয়। ইসলাম ঐ সমস্ত শোষণের রূপকে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ

১৫১. মুসলিম।
১৫২. বুখারী।
১৫৩. বায়হাকী।

www.pathagar.com

বলে ঘোষণা করে। আর শুধুমাত্র একটি পন্থা জায়েয রাখে। তাহল —উৎপন্ন ফসলের অংশীদারিত্বে ভগ্নাংশের ভিত্তিতে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া।

মুজারাবাতের মধ্যে যেমন শ্রমিক ও পুঁজির যোগানদাতা মালিক সমমর্যাদাসম্পন্ন পৃথক পৃথক স্বাধীন সত্তা ঠিক তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমি-মালিক ও কৃষি-শ্রমিক একই মর্যাদায় আসীন। সে ওজরবশত চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে। তখন আর ভূমি মালিক তাকে কাজ করতে বাধ্য করতে পারবে না।

কিন্তু ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আসল মানস, প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, ভূমি মালিক তারই এক ভাই ভূমিহীন মজুরকে সমস্ত ফসলই যেন দিয়ে দেয়। এটা কত নীচাশয়তার কথা যে তার অতিরিক্ত জমি থাকা সত্ত্বেও সে তার অভাব মেটানোর চেষ্টা করবে না। সে ভূমি মালিক শুধু এই জন্যই মজুরের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের ধন নিজে নিয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে নবী করীম (স.) বলেন, 'যার জমি আছে সে তা নিজে চাষ করবে; তা' নাহ'লে তার জন্য উচিত তারই এক ভাইকে (বিনিময় ব্যতিরেকে উৎপন্ন ফসল ভোগ করতে দিয়ে) দেওয়া।'.১৫৪

তৎকালে কৃষি বন্দোবস্তের মাধ্যমে সাধারণ মেহনতীজনদের উপর যে জুলুম ও নির্বিচারে শোষণ চলত আর যেহেতু এ ব্যবস্থা অত্যাচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হত তাই শোষণকে সমূলে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যবস্থাকে তেমন সুনজরে দেখেন নাই—এর সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এবং অন্য কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ উক্ত পন্থাকে অবৈধ বলে মত পোষণ করেছেন—একে তেমন উৎসাহের নজরে দেখেন নি।

এই সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যাদান করতে যেয়ে আল্লামা আবদুর রহমান জুয়াইরী যে দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করেছেন তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ

অনেক ভূমি-মালিক এমনও রয়েছে যারা (শকুনীর মত) শ্রমিকের অসহায় অবস্থা ও তার অভাবের তালাশে থাকে। সব সময় সুযোগ খুঁজে বেড়ায় যে, কখন মেহনতীজন তার জমি চাষ করবে। শেষে অসহনীয়

১৫৪. মুসলিম।

www.pathagar.com

অবস্থার তাড়নায় যখন কোন মেহনতীজন তার দ্বারস্থ হয় তখন সে (ভূমি-মালিক) এমন সব শর্ত আরোপ করতে থাকে যে, উক্ত শর্তবিলীর বোঝা বহন করা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। কিন্তু শ্রমিক তার অভাব মেটাতে যেয়ে ঐ সমস্ত শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। আর তার মেহনতের সমস্ত ফল ভূমি-মালিক (প্রায় একক ভাবেই) দখল করে নেয়। এমনিভাবে ভূমি-মালিক কৃষি শ্রমিকের সঙ্গে ভূমি ও শ্রমের অনুপাতে যে চুক্তিতে গিয়ে পেঁাছেছিল তা' থেকে উৎপন্ন ফসল হতে সে অনেক বেশী হারে নিয়ে কুক্ষিগত করে ফেলে।

শরীয়তে ইসলাম কখনও এমন জুলুমকে সহ্য করতে পারে না কারণ ইসলাম দুর্বল, অসহায়, পেরেশান ও উদ্বেগাকুল জনদেরকে সাহায্য করা এক অবশ্যকরণীয় কর্তব্য বলে ঘোষণা করে। তাই যে ভূমি-ব্যবস্থা শ্রমিককে তার মেহনত হতে বঞ্চিত করে রাখে অভাবগ্রস্ত-জনের অভাবের সুযোগ নিয়ে উক্ত ব্যবস্থাকে আরো অধিক সম্পদ অর্জনের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত করে—সেই ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করাই যুক্তিসঙ্গত—মানুষকে এ থেকে ফিরিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন সাধারণভাবে শোষণের মনোভাব না থাকে সকলই সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কাজ করে ভূমি-মালিক ও কৃষি-শ্রমিক উভয়ই একে অন্যজনের অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখে, প্রত্যেকেই ভূমি ও শ্রমের অনুপাতে আপন আপন হিস্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পায়। একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন রকমের অসৎ অভিপ্রায় না রাখে, ভূমি মালিক বদনিয়ত না করে এবং শ্রমিকজন ও শ্রমে খিয়ানতকরণে লিপ্ত না হয়, সর্বোপরি পরিবেশের চাহিদা যদি মুজারাআত বা অংশীদারিত্বে কৃষি বন্দোবস্ত করা হয়, তবে এই অবস্থায় যে সমস্ত উলামা-ই কিরাম-এর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন তাদের মতেও এর (মুজারাআতের) অনুমতি দিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।[১৫৫]

মুসাকাত

কৃষি ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শ্রম বিনিয়োগ করার নাম 'মুজারাআত,' আর ফল ইত্যাদির বাগানে উক্তরূপ শ্রম-বিনিয়োজিত হলে, তাকে 'মুসাকাত' বলা হয়। সমস্ত ব্যাপারে এ মুজারাআতের মতই।

১৫৫. কিতাবুল ফিক্‌হ আলা মাজাহেবিল আরবা।

www.pathagar.com

কেরায়াতুল আরজ

ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যতম শ্রমবিনিয়োগ পন্থা হলো 'কেরায়াতুল আরজ'। শ্রমিক যদি মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কৃষিক্ষেত্রে শ্রম-বিনিয়োগ করে তবে একে 'কেরায়াতুল আরজ' বলা হয়। এ ব্যাপারে কোন ইমামেরই মতবিরোধ নেই।

হযরত রাফে (রাঃ) বলেছেন, 'মুজারাআতের' ভিত্তিতে কেরায়াতুল আরজ করা নবী করীম (স.) নিষিদ্ধ করেছেন। যখন এই কথা বর্ণনা করেছিলেন তখন' হানযালা ইবনে কায়েস তাঁকে বললেন, 'সোনাচান্দি অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবস্থার মাধ্যমেও কি এ জায়েয হতে পারে না ?'[১৫৬]

হযরত রাফে বললেন–'এতে কোন অসুবিধা নেই।'

শিরকতে সানাএ

এক জাতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের কয়েকজন কারিগর যদি সম্মিলিত-ভাবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিজেদের শিল্প-দ্রব্যের কারবার পরিচালনা করে, তবে ঐ ব্যবস্থাকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় 'শিরকতে সানাএ' বলা হয়ে থাকে। যেমন কয়েকজন শিল্পী নিজেদের তৈরী বেতজাত দ্রব্যের কারবারের জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মিলিত সংঘ গঠন করে, তবে একে 'শিরকতে সানাএ' বলা হবে।

এই পন্থায় সংঘভুক্ত সমস্ত কারিগর ও মিস্ত্রী লাভ হলে এর অংশ পাবে। আবার লোকসান দেখা দিলে এরই ঝুঁকি গ্রহণ করবে। এবম্বিধ সংঘ শ্রমিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থান রাখে। আর এর ফলে শ্রমিকগণও নিজেদের শ্রম বিনিয়োগ করতে অধিকতর উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং যথেষ্ট লাভ অর্জন করার সুযোগ পায়।

শিরকতে উজুহ্

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী শ্রম বিনিয়োগের অন্যতম পন্থা হল 'শিরকতে উজুহ্'। কোন রকমের পুঁজি ব্যতিরেকে যদি কয়েকজন শ্রমজীবী নিজেদের উপার্জিত আয় পরস্পর সমানাধিকারের ভিত্তিতে বণ্টন করে নেওয়ার এবং নিজেদের মেহনত ও উপার্জনে সম-অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে একে 'শিরকতে উজুহ্' বলা হয়।

---

১৫৬. মুসলিম।

www.pathagar.com

এই পন্থায় বিকি-কিনি, লাভ-লোকসান সকল ব্যাপারেই সংঘভুক্ত সকলেই সমভাবে অংশীদার হবে। লাভ হলে সকলেই সমভাবে বেটে নেবে, আর লোকসান দেখা দিলে সকলই সমভাবে এর ঝুঁকি গ্রহণ করবে।

ইহ্ইয়া-ই-মাওয়াত

অর্থাৎ অনাবাদী ভূমি আবাদকরণে শ্রম বিনিয়োগ করা। এই পন্থায় মেহনতীজন সরাসরি সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। ইসলামী গুণের অধিকারী সরকারের অনুমতি নিয়ে যে বা যারা অনাবাদী ভূমি আবাদকরণে আপন আপন শ্রম বিনিয়োগ করবে, সে বা তারাই এর মালিক হবে।

এদিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মালিকবিহীন অনাবাদী ভূমি আবাদ করবে, সে-ই এর যোগ্য অধিকারী।"[১৫৭]

ইজারা

সুনির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোন কারখানা বা শিল্পকর্মে অথবা কারও কোনরূপ কারবারে শ্রম বিনিয়োগ করাকে 'ইজারা' বলা হয়। আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় এমনি ধরনের শ্রম বিনিয়োগ-কারীকেই শ্রমিক বলা হয়ে থাকে।

ইসলাম শ্রম বিনিয়োগের এই পন্থাকেই জায়েয রাখে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত পুঁজিপতি শ্রমিকের অভাব ও দারিদ্র্যের সুযোগ যদৃচ্ছা তার উপর জুলুম ও শোষণ চালাবে, যেভাবে ইচ্ছা মজুরি নির্ধারণ করবে, ইচ্ছা হলে ছাঁটাই করে দেবে—এবম্বিধ লাগামহীন স্বাধীনতা ইসলাম পুঁজিপতিকে দেয় না। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

এতক্ষণের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ইসলাম শ্রমিককে আপন শ্রম ব্যয় করার বিশালতম ময়দান তার সামনে তুলে ধরেছে। যদি আজকের মেহনতী জনতা পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে একান্ত আবাদভাবে ইসলামের দেয় সুবিধাসমূহ ব্যবহার করতে পারত, কোন সমাজব্যবস্থা যদি পরস্পরিক সহযোগিতার উক্ত পন্থাসমূহ বাস্তবভাবে কার্যকরী করার প্রয়াস পেত, তবে বেকারত্ব ও জুলুমের অবসান কত ত্বরান্বিত হত,

১৫৭. মিশকাত।

www.pathagar.com

কত জলদি অভাবের দিনগুলি দূর হয়ে এক অনাবিল শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকের বস্তুতান্ত্রিক অর্থনীতি শ্রম বিনিয়োগের কার্যকরী ও সহজতর পন্থাগুলিকে অত্যন্ত জটিল করে মানুষকে একান্তভাবে অসহায় করে তুলেছে। সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ার ঘৃণ্যতম মাধ্যম সুদী কারবারের প্রচলন তারা করেছে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতেই আজকের পৃথিবী মারাত্মক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হল—জায়েয এবং নাজায়েয। সে কতকগুলিকে বৈধ এবং অন্য কতকগুলিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, মূলত সে মৌলিক ন্যায়কেই জায়েয ও অন্যায়কেই নাজায়েয ঘোষণা করেছে। মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ, তার সহজাত প্রকৃতির খেলাফ—মানবতার জন্য শ্বাসরুদ্ধকর সমস্ত ক্রিয়া-কর্মই ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জিনিস মানুষের স্বভাবকে জাগিয়ে তুলে, নতুন সম্ভাবনার দিকে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ্ পাকের দিকে ন্যায় ও কল্যাণের মূল উৎসের দিকে টেনে নিয়ে যায়, সে সব জিনিসই ইসলাম বৈধ, অনেকক্ষেত্রে অবশ্যকরণীয় বলে ঘোষণা করেছে।

ইসলামে শ্রম বিনিয়োগের পন্থাগুলিও এর আওতাভুক্ত। ইসলামী শ্রম বিনিয়োগ পন্থার মৌল কথা হলো, যে সব ক্রিয়াকার্য মানুষের মানবিকতায় খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার মানসিকতায় অশুভ প্রভাব বিস্তার করে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে, সর্বোপরি সমাজ ও সামাজিক পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে, সেসব ক্রিয়াকর্মে আল্লাহ্ প্রদত্ত আমানত শ্রম-শক্তিকে ব্যয় করা এক মারাত্মক রকমের খিয়ানত, মানবতার সঙ্গে চরম গাদ্দারী। তাই সেই সব কার্যে শ্রম বিনিয়োগ করাও অবৈধ।

অর্থাৎ যে জিনিস উৎপাদন, ব্যবহার, বিক্রি ইত্যাদি করা হারাম সে সব স্থলে শ্রম বিনিয়োগ করাও হারাম। যেমন মদ, জুয়া, সুদী কারবার, ব্যভিচার, নাচ-গান ইত্যাদি।

নবী করীম (স.) ইরশাদ ফরমান, 'আল্লাহ্ পাক যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন এর বিনিময়ও হারাম করেন।'[১৫৮]

---

১৫৮. দারেকুতনী

www.pathagar.com

আর এদিকে ইঙ্গিত করতে যেয়ে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান, 'হে লোক সকল, তোমরা যমীন হতে তাই ভক্ষণ কর, যা হালাল এবং পবিত্র। (হারাম খেয়ে বা অবৈধ পন্থায় শ্রম বিনিয়োগ করে) শয়তানের পদ-চিহ্নের অনুসরণ করো না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য এক দুশমন।'[১৫৯]

আমরা জানি মানুষের উপর পেশাগত কর্মের প্রভাব পড়েই থাকে। কর্মের গুণগত বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানুযায়ী তার উপর এর প্রতিক্রিয়া হয়। কয়লার খনিতে নিযুক্ত একজন শ্রমিকের মানসিকতা আর যিনি অধ্যাপনায় লিপ্ত রয়েছেন তার মানসিক রুচিবোধ কখনও এক-ই রকমের হতে পারে না, এ বাস্তব সত্য।

ইসলাম একে স্বীকার করে। তাই যে সমস্ত কাজ শ্রমিকের মানসিকতা ও নৈতিকতার উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, পরিমাণে তাকে নিকৃষ্টতর করে তোলে সে সমস্ত স্থলেও শ্রম বিনিয়োগ করা ইসলাম পসন্দ করে নি। ইসলাম চায় একজন শ্রমিক তার শ্রমকে এমনি রাস্তায় ব্যয় করুক যাতে তার নৈতিক অধঃপতন না ঘটে—সে জঘন্য মানসিকতার শিকারে পরিণত না হয়ে পড়ে।

---

১৫৯. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا - ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ○

www.pathagar.com

কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাকরণে সরকারী দায়িত্ব

ইসলামে বেকারত্বকে একটি সুস্থ সমাজের জন্য মারাত্মক অভিশাপ বলে মনে করে। একে সে কোনদিনই সহ্য করতে পারে না। তাই ইসলাম বেকারত্বকে দূরীকরণের নিমিত্ত বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শ্রম বিনিয়োগের এত পর্যাপ্ত সুযোগ থাকার পরও যদি কোন ব্যক্তি ঘটনাক্রমে বেকার থেকে যায় বা তার শ্রমশক্তি কাজে লাগাতে না পারে, তবে তখন তার শ্রম বিনিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের জন্যে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে যে রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের শ্রম-বিনিয়োগ স্থলের ব্যবস্থা করতে না পারে সে রাষ্ট্র কোনদিনই জনকল্যাণমুখী হতে পারে না। কারণ এ সর্বজনমান্য কথা যে, সমাজের শুধু একাংশ যদি কাজের সুযোগ পায় ও উপার্জন করে আর অন্যরা বেকার জীবন-যাপন করে তবে অবশ্যম্ভাবী রূপেই অর্থনৈতিক চাপ তীব্র হয়ে ওঠে এবং জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পায়। ফলে জাতীয় অর্থ-সম্পদ মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে বাধ্য হয়। তাই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কোন সরকারই একে এড়িয়ে চলতে পারে না। অনেক সময় জরুরী ভিত্তিতে হয়েও এর ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

তাই আমরা ইতিহাসের পাতায় আরও জ্বলজ্বল করতে দেখতে পাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার ক্ষুদ্র একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিনায়ক, তখন সুস্থ, সবল ও কার্যক্ষম এক ভিখারী এসে তাঁর কাছে কিছু মাগ্‌ল। নবী করীম (স.) তার ঘরের খবর নিয়ে জানতে পারলেন তার কাছে কম্বল ও পান করার একটি পাত্র আছে। তা-ই আনিয়ে তিনি সেগুলি নিলামে বিক্রি করে দিলেন এবং কিছু দিয়ে একটি কুঠার আনিয়ে নিজে হাতল লাগিয়ে দিলেন ও কাঠ কেটে আপনার শ্রম বায় করে তাকে জীবিকা নির্বাহের আদেশ দিলেন। পরে কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল লোকটির আর্থিক-ব্যবস্থা বেশ সচ্ছল হয়ে উঠেছে।[১৬০]

১৬০. মাজমাউজ জাওয়াইদ—লিল হায়সামী।।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ), যিনি ছিলেন ইসলামী আইনের একজন মূর্ত রূপ, তাঁর খিলাফতের আমলে একদিন মসজিদে এসে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি হাত দরাজ করে বলে বেড়াচ্ছে,—'জিহাদের নিমিত্ত আমাকে কেউ কিছু সাহায্য করতে পারেন ?'

আমরা জানি 'জিহাদ' হলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল যা আল্লাহ্ পাক ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ্র নিমিত্ত বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছেন। আর ঐ ব্যক্তি এর জন্যই সাহায্য চাচ্ছিল, ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নয়, তবু হযরত উমর (রাঃ) সামনে এগিয়ে এলেন, তার হাত ধরলেন এবং উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে একে কাজ করানোর জন্যে নেবে ?'

একজন উঠে বললেন, 'আমি নিয়ে যেতে পারি। আমার প্রয়োজন রয়েছে।'

হযরত উমর (রাঃ) তখন নিজেই পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দিয়ে তাকে তার যিম্মায় দিয়ে দিলেন।

এরপরও হযরত উমর (রাঃ) তাকে ভুলে যান নি। কয়েকদিন পর যে ব্যক্তি তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার কাছে খবর নিলে তিনি বললেন, 'সে বেশ আনন্দেই আছে এবং অনেক টাকা সঞ্চয় করে ফেলেছে।'

হযরত উমর (রাঃ) সঞ্চিত অর্থসহ তাকে তাঁর এখানে পাঠিয়ে দিতে বললেন। তখন ঐ ভিক্ষুককেই দেখা গেল, গলায় বিরাট এক ভারি থলি ঝুলিয়ে হযরত উমর (রাঃ)-এর দরবারে আসছে। ঐ সময় হযরত উমর (রাঃ) ঐ থলিটির দিকে ইঙ্গিত করে তাকে বলেছিলেন, 'এ নিয়ে যাও। আর জিহাদ করতে সাধ থাকলে তাও করতে পার। নইলে ঘরে চলে যেতে পার।'[১৬১]

১৬১. কানযুল উম্মাল।

www.pathagar.com

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে নবী করীম (স.)-এর নির্দেশাবলী

শিল্প বিপ্লবের ফলে কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পগুলি বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে, ব্যবসার সমস্ত উপায়-উপকরণ পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ায় আধুনিক পুঁজিপতিরা নিজেদের সামনে যেন স্বর্গের এক দরওয়াজা খুলে যেতে দেখতে পায়। তারা সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগ করে মিল কারখানা কায়েম করে, তার-ই মত, তার-ই উপাদানে গঠিত তারই অন্য এক ভাই দরিদ্র ও সর্বহারা মজুর জনতার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে, তাদের উপর এক ঘৃণ্য রাজত্ব চালাতে শুরু করে দেয়।

মজুরির বিনিময়ে তারা মজুরের জান-মাল, ইযযত, আব্রু সব কিছুরই যেন হর্তাকর্তা বনে যায়। তাদেরকে গোলাম, শুধু তাই নয় এমন কি পশুর চেয়েও হীন এক জীব বলে মনে করতে থাকে তারা। পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি তারা করতে পারে কিন্তু শ্রমিক-জনতার কাতর আর্তনাদেও তাদের চেতনার উদ্রেক হয় না।

সবচেয়ে কৌতুকপ্রদ ব্যাপার হলো, বিংশ শতাব্দীর মুক্ত সভ্যতার যুগে যখন গোলামী মানবতার এক চরম অপমান বলে স্বীকৃত, তার বিরুদ্ধে পার্কে, ময়দানে, হলে গরম গরম বক্তৃতা বর্ষণ করা হয় তখন এরাই শ্রমিক নামে আর এক গোলামীর জন্ম দিয়েছে।

তারা একে শুধু যে বৈধই মনে করে তা নয়, বরং একে নিজেদের আরামপ্রিয়তার, শাহান শইয়্যাতের এক শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম বলে মনে করে। মজুরের রক্তের উপর নিজেদের আয়াশ ও তানায়েমের ভিত গড়ে তোলে। নিজেদের শোষণকে আরও মজবুত করার জন্য প্রশাসন ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়—স্বার্থ পূরণের নিমিত্ত নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে। সর্বোপরি তারা যখন নিজেদের জুলুমের সমর্থনে ধর্ম এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ছত্র-ছায়া গ্রহণ করে তখন এই খেলা আরও অসহনীয় হয়ে উঠে।

অধিক শ্রম কিন্তু তদনুযায়ী মজুরি এবং সাধারণ মানবীয় অধিকার বঞ্চিত এই সর্বহারাদের করুণা উদ্রেককারী অবস্থা যদি পর্যবেক্ষণ

www.pathagar.com

করতে হয় তবে আমাদের শিল্প এলাকার দিকে যেতে হয়—যেখানে একদিন উদ্যান শোভিত বিরাট মর্মর প্রাসাদে একান্ত আয়েশে চোখ বুঁজে আছে পুঁজিপতি আর তারই পাশাপাশি অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কুঁড়ে ঘরে বাস করছে এক প্রকার জীব, যার নাম আধুনিক পরিভাষায় 'শ্রমিক'।

পক্ষান্তরে ইসলাম এমন এক জীবন বিধান, যা মানুষের সার্বিক শান্তির নিশ্চয়তা দান করে। ইসলামের অন্যতম প্রধান জিজ্ঞাসা এই যে, মানুষের ভিতর ঐ রকমের জুলুম ও শোষণের মনোবৃত্তিই বা কেন থাকবে? সে যে আল্লাহ্‌র খলীফা। আল্লাহ্ আদেল—ন্যায়নিষ্ঠ। তাই তাঁর প্রতিনিধি যে হবে সেও হবে আদেল ন্যায়নিষ্ঠ।

ইসলাম মানুষের গোটা মনোবৃত্তিকেই আমূল পরিবর্তন করে দেয়। আর এ-ই ইসলামের প্রধান সার্থকতা। সে মানুষকে প্রথম হতেই এমনি করে গড়ে তোলে, যাতে তার মধ্যে পাশবিক ও শোষণমূলক বদ ভাবধারার জন্ম না হয়, এর বিকাশ তার মধ্যে না ঘটে। সে যেন সহানুভূতিশীল, মানবতাবাদী এবং শোষণমুক্ত মনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে, এর ব্যবস্থা ইসলাম করে।

এর জন্য ইসলাম কতকগুলি নির্দেশ দেয়, ন্যায়-নীতি নির্ধারণ করে এবং এরই প্রেক্ষিতে একটি শোষণমুক্ত অনাবিল পরিবেশ গঠন করে সমাজ বানায়।

আমরা জানি মানুষের মধ্যে জুলুম ও শোষণের প্রবৃত্তি সাধারণত আত্মস্বার্থ পূরণের এক জঘন্য লালসা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা হতেই জন্ম নেয়। ইসলাম প্রথমে এরই চিকিৎসা করেছে। ধনোপার্জনের স্বার্থবাদী লক্ষ্যই সে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থানুসারে মৌল কথাই হল আত্মস্বার্থ চরিতার্থকরণ। যেখানে আপন স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, সেখানে ন্যায়নীতির কোন মূল্যই নেই। ম্যাকস্ স্টিরনারের ভাষায়ঃ

> যে কাজের সঙ্গে আমার স্বার্থ বিজড়িত নেই তা' ছুঁড়ে ফেলে দাও। এর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? তোমরা হয়ত বলতে পার অন্ততঃ ভাল এবং সৎকাজের সঙ্গে ত তোমার সম্পর্ক রাখার কথা।

www.pathagar.com

কিন্তু সৎ-অসৎ আবার কি? আমার সম্পর্ক শুধু হা, শুধু আমার সঙ্গেই। আর আমি সৎও নই, অসৎও নই। উভয় শব্দটি আমার ব্যাপারে নিরর্থক, সারগর্ভহীন। আমার কাছে আমার চেয়েও বেশী, আমার চেয়েও প্রিয় আর কিছুই নেই।[১৬২]

তাই সেখানে মানুষ নিজের আয়াশ, আপনার আরাম ও সুখ পূরণের নিমিত্তই অর্থোপার্জন করে থাকে, সমষ্টিগত প্রয়োজন পূরণের আবেদন যেখানে অত্যন্ত গৌণ।

বিলাসী জন খামখেয়ালী এবং অত্যাচারী হতে বাধ্য—এ সর্বজনমান্য কথা। আর এই অহেতুক বিলাসপ্রিয়তাই আজ মানুষের জীবনকে করে তুলেছে জটিল এবং দুর্বিসহ। মুষ্টিমেয় পুঁজি-মালিকের বিলাসের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে হাজারো, লাখো আদমসন্তান।

পক্ষান্তরে ইসলাম বলেছে, ধনোপার্জনের উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি ও বিলাসভোগ নয়, বরং একজন লোক শুধু এই কারণেই ধনোপার্জন করবে যে, সে ব্যক্তিগত আয় দ্বারা জাতীয় আয় বাড়াবে, জাতীয় কল্যাণ সাধন করবে। সর্বোপরি এতে পরকালীন সফলতা অর্জন তার মূল লক্ষ্য বিন্দু হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। বিলাসপ্রিয়তাকে ইসলাম কোনক্রমেই সমর্থন জানায় নি—জানতে পারে না। আল্লাহ্ পাক ফরমান—যা কিছু আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন এর মাধ্যমে তুমি পরবর্তী আবাস লাভে সচেষ্ট হও।[১৬৩]

এইজন্যই দেখা যায়, যে স্থানেই ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে বিরোধ লাগতে পারে, সেখানেই ইসলাম সমষ্টির স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

মূলত উপরোক্ত বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতিতেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় শোষণের কোন প্রবৃত্তির জন্ম নেওয়ার অবকাশ হয় না।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম জুলুম ও শোষণের ঘৃণ্যতা এবং এর বীভৎসতা সম্বন্ধে প্রত্যেকটি মানুষের মনে এক অনুভূতি জাগিয়ে তুলে, যাতে সে মন থেকে একে ঘৃণা করতে পারে, এ থেকে ফিরে থাকতে পারে, কোন বাধ্যবাধকতা বা চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন না হয় সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রতি প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করে তোলে, উৎসাহিত করে তোলে।

---

১৬২. Man Stirner The Ego and his Own

১৬৩. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান—তোমরা পরস্পরে সৎকর্ম এবং পরহেজগারিতে সহযোগিতা কর এবং অপকর্ম ও বাড়াবাড়িতে (জুলুম অত্যাচারে) তোমরা একে অন্যের সহযোগী হয়ো না।[১৬৪]

উক্ত বক্তব্যটি আরো স্পষ্ট করে কর্তৃত্বব্যঞ্জক বাচনভঙ্গি সহকারে আল্লাহ্ পাক অন্য একটি আয়াতে বলেন,—আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে, নিকট আত্মীয়দেরকে সম্পদ দিতে, আর লজ্জাকর ও অসৎকর্ম এবং জুলুম করা হতে ফিরে থাকতে। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নসিহত করেছেন, যাতে তোমরা নসিহত গ্রহণ কর।[১৬৫]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পরিণাম কি হতে পারে তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—জুলুম ও শোষণ কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ হবে।[১৬৬] অর্থাৎ অন্ধকারে মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, কাউকে সাহায্যকারী পায় না, ঠিক তেমনি জালিম কিয়ামতের দিন অসহায় হয়ে পড়বে।

তিনি আরও বলেছেন—তোমরা মানুষকে অত্যাচার এবং শোষণ করো না। নিশ্চয়ই যারা দুনিয়ায় মানুষের উপর শোষণ চালাবে, তাকে কিয়ামতের দিন মারাত্মক শাস্তি প্রদান করা হবে।

এমন কি আল্লাহ্ পাক কুফরকে, তাঁকে অস্বীকার করাকে পর্যন্ত দুনিয়াতে সহ্য করেন কিন্তু শোষণকে কোন স্তরে কোন ভাবেই সহ্য করেন নি। দুনিয়াতেই তিনি প্রত্যেকটি জালিমকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছেন এই শাস্তিতে দেরী দেখে মানুষ হয়ত মনে করে জুলুম বুঝি এভাবেই চলতে থাকবে, কিন্তু যেদিন আল্লাহ্ পাক জালিমকে ধরেন, সেদিন তার আর বাঁচবার কোন পথই থাকে না।

নবী করীম (স.) বলেছেন আল্লাহ্ পাক জালিমকে (অনেক সময় সাময়িক তাকে) ছেড়ে দেন, কিন্তু যখন তাকে ধরেন তখন আর তাকে ছাড়েন না, ধ্বংস হয়ে যায় সে। এরপর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সল্লাম কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—এমনিভাবে যখন আল্লাহ্ পাক কোন এলাকার অত্যাচারী

---

১৬৪. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

১৬৫. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

১৬৬. বুখারী

www.pathagar.com

অধিবাসিগণকে ধরেন (তখন এদেরকে ধ্বংস করেই ছাড়েন) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি অত্যন্ত কঠোর ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে।"[১৬৭]

অত্যাচার ও অবিচারের পরিণতিতে আল্লাহ্র যে আজাব নেমে আসে তা এতদূর ভয়াবহ ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে যে, সাধারণ জীব-জন্তুও এ থেকে বাঁচতে পারে না। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হুরায়রা (রাঃ) একবার এক ব্যক্তিতে বলতে শুনলেন অত্যাচারের পরিণাম একমাত্র অত্যাচারীই ভোগ করে থাকে। তখন তিনি বলে উঠলেন—"না, না, এরই পরিণামে হুরায়রা পক্ষীও তার বাসায় মরে পড়ে থাকে।"[১৬৮]

পক্ষান্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নম্রতাকে, নম্র ব্যবহারকে মানব চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূষণ বলে মনে করেছেন। তিনি ফরমান, "আল্লাহ্ পাক দয়ালু ও মেহেরবান। তাই নম্রতাকে তিনি ভালবাসেন। নম্রতার গুণে আল্লাহ্ পাক একজনকে এমন কিছু দেন যাহা কঠোরতায় পাওয়া যায় না।"[১৬৯]

ইসলামের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে প্রথম কারও উপর চাপ প্রয়োগ করে না, বরং ভিতর থেকে তাকে তার মানসিকতাকে গঠন করে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই, যেখানেই ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা বাস্তবভাবে কায়েম হয়েছে, সেখানেই শোষণের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়েছে। সেখানে শিল্প মালিক বা নিয়োগকর্তা কখনও শ্রমিক ও মেহনতীদের প্রতি শোষণের এবং প্রবঞ্চনার মনোভাব নিয়ে তাকায় না।

তদুপরি ইসলাম শ্রমিকদের সমস্যা নিরসনে এবং তাদের অধিকার পূরণে অত্যন্ত সজাগ, বাস্তব ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। এ ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। নবী করীম (স.) এদের সম্পর্কে বলেছেন, "এরা তোমাদের ভাই—তোমাদের খিদমত করেছে।" আল্লাহ্ এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যার যে ভাই তার অধীনে রয়েছে তাকে যা সে নিজে খায় তা থেকে খেতে দেবে। যা সে নিজে পরে তাই তাকে পরাবে। আর যে কাজ তার জন্য অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিও না। অগত্যা যদি সে রকমের কাজ করাতেই হয় তবে নিজে (স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে) তাকে সাহায্য কর।"[১৭০]

১৬৭. কিতাবুল খারাজ।

১৬৮. মিশ্কাত।

১৬৯. ওয়া কাযালিকা আখাযা রাব্বুকা ইযা আখাদাল ক্বোরা ওয়াহিয়া জালিমাতুন আখাযাহু আলীমুন শাদীদ।

১৭০. বুখারী।

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা আল্লামা গিলানী (রঃ) উক্ত হাদীসটির বিস্তৃত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা দ্বারা ইসলামে শ্রম-নীতির কয়েকটা সুস্পষ্ট ধারা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে ঃ

ক. ইসলামের বুনিয়াদী লক্ষ্য হলো, শ্রমিক ও তার নিয়োগকর্তা তারা যেন একে অন্যকে ভাই বলে মনে করে এবং তাদের পরস্পরের জন্য যেন সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিরাজমান থাকে।

খ. অন্তত খাকা-খাওয়ার ব্যাপারে এদের পরস্পরের মধ্যে যেন অর্থনৈতিক সমতা বিদ্যমান থাকে। এ দ্বারা মজুরি নীতির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের মৌল দৃষ্টিভঙ্গী হলো, শ্রমিককে অন্তত এমন মজুরি দেওয়া উচিত যা দ্বারা মজুরও মালিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা এসে যায়। আজকাল শ্রমিকদের মজুরি যদি সেই পর্যায়ে উন্নীত করা যায় তবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার সংঘর্ষ অতি সহজেই বিলুপ্তি সাধন করা সম্ভব হবে।

গ. কাজের সময় ও প্রকৃতি উভয় দিক থেকে শ্রমিকের উপর এতটুকু বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তাকে বিপন্ন করে ফেলবে। সে কষ্ট-কর শাস্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। "তাদের জন্য যা অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিও না।"—নবী করীম (স.) এর এই উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বর্তমান শ্রমিকদের কাজের সময় ও এর প্রকৃতির জটিলতা অনায়াসে দূরীভূত করা যায়।

ঘ. এমন কোন কাজ যদি এসে পড়ে, যা মজুরের জন্য করা অতি কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তখন এ বন্ধ রাখতে হবে বা মজুরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে তার দ্বারা এ কঠিন কাজ করিয়ে নেওয়া উচিত নয় বরং নিয়োগকর্তা বা মালিক অধিক শ্রমশক্তি নিয়োগ করে তার কাজকে হালকা করে দিতে সাহায্য করবে। "অগত্যা যদি করাতেই হয় তবে তাকে নিজে সাহায্য কর"—এর অর্থ এ-ই।[১৭১]

এ শুধু কথার ফুলঝুড়ি নয় বরং সাহাবা-ই-কিরাম নিজেরাও এভাবে চলেছেন এবং অন্যদেরকেও এভাবে চলতে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) তায়েফের শস্য-শ্যামল অঞ্চল ওয়াহাত হতে একজনকে আসতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শ্রমিকেরা কি কাজ করছে ?' তিনি বললেন, 'জানি না

১৭১। ইসলামী মুয়াশিয়াত।

www.pathagar.com

তখন ইবনে আমর বললেন, "তুমি যদি 'সকিফীয়' হতে তবে তাদের কাজের প্রকৃতি বুঝতে পারতে।"

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর ইবনে আমর (রাঃ) আমাদের দিকে চাইলেন,—বললেন যদি কোন লোক শ্রমিকদের সঙ্গী হয়ে তার ঘরের কাজ করে তবে সে আল্লাহ্‌র শ্রমিক বলে পরিগণিত হবে।"[১৭২]

উক্ত ঘটনাটি দ্বারা সাদাসিধাভাবে তো এই বোঝা যায় যে, মালিক শ্রমিকের মতই তার সঙ্গে কাজ করবে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র শ্রমিকে পরিগণিত হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে।

আজকাল এতটুকু নয়, কোন মালিক যদি অধিক শ্রমশক্তি নিয়োগ করে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, দুটি সুখ-দুঃখের কথা তাদের কাছে এসে বলতো তবে তারা প্রত্যেকেই তাদের হাতের কাছে স্বর্গ পেত।

শ্রম বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহের আলোচনায় আমরা দেখিয়ে এসেছি যে, ইসলাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিককে লভ্যাংশের অধিকারী বানায়। অবশ্য 'ইজারার' মধ্যে সে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের মালিক হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক লাভের পর যাতে সে লাভেরও অংশীদার হতে পারে।

ধনবাদী অর্থনীতিতে যে বাড়তি মূল্যের সৃষ্টি হয় তা একমাত্র পুঁজিপতিকেই নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে দেওয়া হয়ে থাকে। শ্রমিক এ থেকে কিছুই পায় না। পক্ষান্তরে ইসলাম একে শ্রমিক-মালিক উভয়ের মধ্যেই বণ্টন করতে চায়। এই সংশ্রবে নবী করীম (স.) ফরমান—মজুর ও শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহ্‌র মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না।[১৭৩]

উক্ত হাদীসে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে ঃ

ক. নবী করীম (স.) শ্রমিককে মর্যাদায় এতটুকু উন্নত করেছেন যে, তাকে তিনি আল্লাহ্‌র শ্রমিক বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ সে কোন পুঁজিপতির গোলাম নয়।

খ. তাকে লাভের অংশ না দেওয়াকে বঞ্চনা বলে অভিহিত করেছেন। এতে বোঝা যায় লভ্যাংশেও নৈতিকভাবে শ্রমিকের অধিকার জন্মে

---

১৭২. আল-আদাবুল মুফ্‌রাদ।

১৭৩. মসনদে আহ্‌মদ আল-আদাবুল মুফ্‌রাদ।

www.pathagar.com

যায়। তার এ শ্রমিকের প্রতি পুঁজিপতির কোন রকমের অনুগ্রহ বা অনুকম্পা নয়। কারণ আমরা জানি অনুগ্রহ করা হতে বিরত থাকলে একে বঞ্চনা বলা হয় না।

উক্ত বক্তব্যটি নবী করীম (স.) একটি হাদীসে আরও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তিনি ফরমান—তোমাদের কারো খাদেম যদি অন্ন প্রস্তুত করে নিয়ে আসে, তবে তাকে নিজের সঙ্গে খাওয়ায় শরিক করে নিও। কারণ সে তোমার জন্যই আগুন ও ধুঁয়ার জ্বালা সহ্য করেছে।[১৭৪]

আজকাল পুঁজিপতিগণ বোনাসের নামে শ্রমিকদিগকে যৎকিঞ্চিত দিয়ে মনে করে বেশ অনুগ্রহ করে ফেলেছি। ইসলামী অর্থনীতির মৌল দৃষ্টিভঙ্গীকে কার্যে পরিণত করে যদি একে সুসংহতভাবে প্রচলিত করা হত আর শ্রমিক যখন এই কথা জানতে পারত যে সেও মূল ব্যবসার মুনাফার অংশীদার তবে তাদের কর্মোদ্দীপনা ও দায়িত্বশীলতা অনেক বেশী বেড়ে যেত। এতে জাতীয় আয়েও এক শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত।

শ্রমিককে বেগার খাটানো ইসলাম অত্যন্ত ঘৃণা করেছে—এর বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। নবী করীম (স.) বলেছেন,—তিন ধরনের ব্যক্তি আছে, কিয়ামতের দিন আমি যাদের দুশমন হবো। আর আমি যার দুশমন হবো তাকে আমি লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে ছাড়ব। উক্ত তিন জনের মধ্যে একজন সে—যে কোন মজুরকে খাটিয়ে নিজের পুরাপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু তার মজুরি দেয় না।[১৭৫]

বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী উক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন—কোন শ্রমিকের নিকট হতে কাজ আদায় করে নিয়ে নির্ধারিত পারিশ্রমিক না দেওয়া কোন স্বাধীন মানুষকে বেচে জীবিকা নির্বাহ করার মতই। কেননা সে যখন বিনিময় ব্যতিরেকেই নিজের কাজ আদায় করে নিল এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে যেন ঐ ব্যক্তির (শ্রমিকের) সত্তাকেই বিক্রি করে নিজের রুজীরুটির উপায় বানিয়ে নিল।[১৭৬]

মজদুর শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কে নবী করীম (স.)-এর কতটুকু গভীর অনুভূতি ছিল এর কিছুটা আন্দাজ হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "মহাপ্রয়াণের সময়ও

১৭৪. বুখারী।
১৭৫. বায়হাকী, বুখারী।
১৭৬. ফতহুল বারী

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) জবান মুবারক থেকে এ শব্দটিই ব্যঙময় হয়ে উঠেছিল —নামাযের খেয়াল রেখো আর যারা তোমাদের অধীন আছে তাদের অধিকার ভুলে যেয়ো না।"[১৭৭]

অন্য এক স্থলে নবী করীম (স.) মালিকদেরকে উৎসাহিত করতে যেয়ে ইরশাদ ফরমান—যাদের মধ্যে তিনটি গুণ আছে, তাদের মৃত্যু অত্যন্ত সহজ হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ পাক জান্নাত দেবেন। সে তিনটির মধ্যে একটি এ-ও অধীনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা।

অনেক সময় শ্রমিকদের তরফ থেকে অসঙ্গত ব্যবহার হতে পারে যার কারণে মালিকের মন বিষণ্ন ও রাগান্বিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু নবী করীম (স.) তখনও তাকে শান্ত থাকতে বলেছেন, তিনি বলেছেন—"যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে পারার ক্ষমতা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধকে দমন করতে পারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তার মন প্রশান্তি ও ঈমানের দ্বারা পূর্ণ করে দেবেন।[১৭৮]

তিনি আরও বলেছেন—অধীনস্থদের সম্পর্কে সতর্ক থাক, এদের সঙ্গে নরমভাবে কথা বল, অসৎ ব্যবহারকারী মালিক কখনও জান্নাতে দাখিল হতে পারবে না।[১৭৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকরা যদি তাদের অধিকার দাবি নাও করে তবুও মালিককে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তা আদায় করে দিতে হবে—নইলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম (স.) বলেছেন—শুনে রাখো, তোমরা সকলেই পরিচালক আর যারা তোমাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৮০]

সাহাবা-ই-কিরাম এই অধিকার আদায়কে নাযাতের উপায় বলে মনে করতেন। তারা ভাবতেন, এ না করলে জুলুম হবে। আর কিয়ামতের দিন মজলুম আমার সব কিছু নিয়ে যাবে। আমি শূন্য হাত হয়ে থাকব।

হযরত আবু ইয়াসর (রাঃ)-কে যখন নিজে যা পরে আছেন, তা-ই তাঁর খাদেমকে পরিয়ে রেখেছেন দেখে একজন জিজ্ঞেস করল—হযরত! কেন এমন করেছেন? তখন তিনি জবাবে অন্যান্য কথার সঙ্গে এই

১৭৭. ইবন মাজাহ্।
১৭৮. আবু দাউদ।
১৭৯. কানযুল উম্মাল।
১৮০. বুখারী।

www.pathagar.com

কথাও বলেছিলেন—তাকে (খাদেমকে) আমার সম্পদ দিয়ে দিব এ আমার জন্য অনেক ভাল যে, সে কিয়ামতের দিন আমার সব নেক আমল নিয়ে যাবে।[১৮১]

অর্থাৎ হাদীসে আছে কিয়ামতের দিন মজলুমকে জালিমের নেক আমল পর্যন্ত দিয়ে তার জুলুমের বদলা দেওয়া হবে। এখন তার সাথে যদি আমি সমব্যবহার না করি তবে আমি জালিম হব, পরিণামে কিয়ামতের দিন সে আমার নেক আমলগুলো নিয়ে নেবে।

মালিক সব সময়ই শ্রমিকের নিকট হতে অধিক হতে অধিক কাজ নিতে চায়। ইসলাম মালিকের অন্তর হতে এই মনোভাব বিদূরিত করে দেয়। নবী করীম (স.) ফরমান—তুমি তোমার খাদেমের কাজ সহজ (হালকা) করে দিও তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন।[১৮২]

তিনি আরও বলেন—তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে-ই, যে অধীনস্থদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।[১৮৩]

অনেক সময় দেখা যায়, মালিকরা মজুরি আদায়ে টালবাহানা করে। তারা এমন হয়রানমূলক আচরণ শুরু করে দেয় যে, শ্রমিক তার কষ্টোপার্জিত সম্পদ হতে সময় মত আর উপকৃত হতে পারে না। ইসলাম এমন আচরণকে এক মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামী অর্থনীতির আদর্শ এসব শাস্ত্রে সহ্য করে নি। নবী করীম (স.) বলেছেন—মালদারের মাল থাকা সত্ত্বেও টালবাহানা করা এক (অসহনীয়) জুলুম।[১৮৪]

তিনি আরও বলেছেন—মজুরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি আদায় করে দিও।[১৮৫]

এবম্বিধ ন্যায়ানুগ নির্দেশাবলী প্রদানের পরও ইসলাম মালিক ও শ্রমিকের জন্য এক মূলনীতি নির্ণয় করে তাদের পারস্পরিক জীবনযাত্রা প্রণালীকে সমতার ভিত্তিতে আনার প্রয়াস পায়। 'শরহে শরআতে ইসলাম' নামক পুস্তকে এই বক্তব্যটিকে অধিকতর বিকশিত করতে যেয়ে বর্ণনা

১৮১. আল-আদাবুল মুফরাদ।
১৮২. হায়সামী।
১৮৩. হায়সামী।
১৮৪. বুখারী।
১৮৫. বায়হাকী।

www.pathagar.com

করা হয়েছে—ইসলাম শ্রমিক-মালিক, ক্রেতা-বিক্রেতা সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রচলন করতে চায়। তার দৃষ্টিতে একজন আর একজনের জন্য তা-ই পসন্দ করবে যা সে নিজের জন্য করে। অর্থাৎ শুধু আপন স্বার্থ সংরক্ষণই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে না, অন্যের স্বার্থও পুরাপুরি আদায় হচ্ছে কি না তা-ও তাকে দেখতে হবে।

এই সমস্ত নির্দেশ বা সতর্কবাণীর ফলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মেহনতীদের যে মর্যাদাপূর্ণ ও সৌভ্রাতৃত্বজনক সম্মান লাভ হয়েছিল—এর হাজারো নিদর্শন প্রথম যুগের মুসলমানদের জীবনালেখ্যে পাওয়া যায়। পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, মজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এর চেয়েও উত্তম অন্য কোন পন্থার উদ্ভাবন সম্ভব হতে পারে না।

কিন্তু এখানে অনেকেরই সংশয়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, মজুরদের অধিকার সংরক্ষণ করতে যেয়ে, যে সমস্ত বিধি-নিষেধের উল্লেখ দেখা যায় সেগুলি নৈতিক হিদায়ত মাত্র—অর্থনীতি ও আইনের দৃষ্টিতে যার কোন মূল্যই নেই। আর আইনের শাসন ও শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন দিনই পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করবে না।

এই সংশয়েই ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে মার্কসীয় সমাজ দর্শনের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাতা 'এঙ্গেল্‌স' বলেছিলেন কোন ধর্মভিত্তিক মূলনীতি কোন দিন পতিত-দের, সর্বহারাদেরকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দিতে পারে না।[১৮৬]

বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মনীষী হযরত মাওলানা মুফতি শফী উক্ত সংশয়টি নিরসন করতে গিয়ে বলেন—"আমি বলবো এরূপ সংশয় ইসলামের মূল প্রকৃতিটি বুঝতে না পারার ফলেই হয়ে থাকে। আমা-দের ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম নিছক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়; বরং এ সামগ্রিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। জিন্দেগীর প্রতিটি ধারা এতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে একত্রে প্রবহ-মান। তার যে কোন একটি শাখা অন্য শাখাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে চাইলে অহেতুক ভুল বুঝা বুঝি-ই এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে দাঁড়াবে। এ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে মাত্র। ইসলামের প্রত্যেকটি শাখার সুষ্ঠু কার্যক্রম একমাত্র তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব, যখন তার সামগ্রিক জীবন-পদ্ধতির সঙ্গে একে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখা হবে। তাই

১৮৬. সোশ্যালিজম ঃ এঙ্গেলস্।

www.pathagar.com

ইসলামের অর্থনীতিতে ঐ সমস্ত নৈতিক নির্দেশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই।

দৃষ্টিকে একটু গভীরতর করে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নৈতিক নির্দেশাবলীও এতে মূলত আইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত। কারণ এর সঙ্গেই তার পরকালীন সুখ-দুঃখ জড়িত—যার গুরুত্ব একজন মুসলমানের জীবনে অপরিসীম।

এই পরকালীন চেতনা ও বিশ্বাস এমন এক জিনিস, যা শুধু নৈতিকতাকেই আইনের মর্যাদা দেয় নি, অধিকন্তু পারিভাষিক আইন-কানুনেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

কুরআনের রচনাভঙ্গির উপর যদি একটু গভীর দৃষ্টি ফেলা যায় তবে দেখা যায় যে, এর প্রত্যেকটি আইন-কানুন এবং নৈতিক নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌ভীতি ও পরকালীন চেতনার বিষয়সমূহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর আসল রহস্য এই যে, মূলত আইনের বিধান লাঠির জোরে চালান সম্ভবপর হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের প্রতিটি কার্যকলাপ ও ধ্যান-ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য পরকালীন চিন্তার পাহারাদারী মওজুদ থাকে; অর্থাৎ আন্তরিক আবেদন ব্যতীত শুধু ডান্ডা ও আইনের শাসনকর্তাকে ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যান্বেষী করে তোলা যায় না। দুনিয়ার হাজার শতাব্দীর ইতিহাস—কঠোর আইনের আবেষ্টনী সত্ত্বেও যা অত্যাচার, অবিচার ও অপরাধ প্রবণতা ভরপুর তাও উক্ত সত্যকে প্রস্ফুটিত করে তুলে ধরে।

আজকের তথাকথিত সংস্কৃতির দাবীদার বিশ্ব একে সূর্যের ন্যায় প্রোজ্জ্বল করে দিয়েছে যে, বাধন যে গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরাধ প্রবণতা তার চেয়েও দুর্জয় গতিতে বেড়ে চলেছে।

তাই বোঝা উচিত মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক ও তাদের অধিকার শুধু আইনের শাসনেই সুষ্ঠু ও সুসংহত হয়ে উঠবে—এই চিন্তা চরম আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ আর কিছুই নয়। এর সত্যিকারের প্রতিষেধক একমাত্র পরকালীন চেতনাই হতে পারে। তাই ইসলাম এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

আজকের মানসিকতা—যা শুধু জাগতিক সমস্যার পেঁচে পেঁচে জর্জরিত হয়ে জড়বাদী চেতনার বাইরে কোন কিছু চিন্তা করার অনুভূতিটুকুও হারিয়ে বসেছে তার জন্য এই সত্যটিকে অনুধাবন করা

www.pathagar.com

মুশকিল হলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে, শান্তি ও নিরাপত্তা যদি আজকের মানবতার ভাগ্যে থেকে থাকে তবে হাজার ঠোকর খেয়ে খেয়ে ঐ মৌল সত্যটির দিকেই তাকে ফিরে আসতে হবে, যার দিকে কুরআনে করীম বারবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে।

যে সময় ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময়ের পৃথিবী কুরআনের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতা খুব ভাল করে প্রত্যক্ষ করেছে। সে সময়কার ইতিহাসে হাজারো তালাশ করেও শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আজ যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম চলেছে এর একটা নজীরও পাওয়া যায় না। সে নীতি পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ঐ নৈতিক নির্দেশাবলী-ই এই সমস্যার একটা নিরাপদ ও সন্তোষজনক সমাধান করে দেখিয়ে দিয়েছিল—যার ফলে ইসলামে প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস আজকের অত্যাচার জবরদস্তি ও হরতালমুখর পরিস্থিতি হতে একেবারে মুক্ত দৃষ্টিগোচর হয়।[১৮৭]

একজন মুমিনের মনে ঐ সমস্ত নৈতিক নির্দেশ কতটুকু আবেদনের সৃষ্টি করতে পারে নিম্নোক্ত ঘটনাটি দ্বারা আমরা তার কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু যর (রাঃ)-কে যখন বলেছিলেন—আবু যর! এরা (অধীনস্থরা) তোমাদের ভাই, নিজে যা খাও তাই তাদেরকে খাওয়াবে, নিজে যা পর তাই তাদেরকে পরাবে। তখন একথা শুনামাত্রই আবু যর (রাঃ) তাঁর পরিধানের কাপড়টি টুক্‌রা করে ফেললেন এবং অর্ধেকটা তাঁর গোলামকে দিয়ে দিলেন। তখন হুযুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি করলে? তিনি জওয়াব দিলেন—আপনি ত তা-ই করতে বললেন।[১৮৮]

এই কারণেই ইসলামী অর্থনীতি প্রচলন করতে গিয়ে অন্যায় চাপ ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করার কোন প্রয়োজনই হয় না। নিজের কল্যাণ ও পরকালীন সফলতার তাগিদে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলেই সেই সমবণ্টন ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্টি করে।

---

১৮৭. ইসলামের অর্থবণ্টন ব্যবস্থা।

১৮৮. মাজমাউজ জাওয়াহীদ ঃ হায়সামী।

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের অধিকার

অধিকারের ফরুয়ী রূপরেখা বা অপ্রধান ধারা কোনদিনই অপরিবর্তনীয় নয়—এ সর্বজনমান্য কথা। মানুষের পরিবেশ, তার আবহাওয়া ও আঞ্চলিকতার পটভূমিতে অধিকারের এই ধারা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। আদিম যুগের মানুষ যাকে নিজের চরমতম পাওয়া, চরমতম অধিকার বলে মনে করত, আজকের মানসিকতায় হয়ত তার কোন আবেদনই নেই। আবার আজকের মানুষ যে বস্তু পাওয়ার জন্য মাথা কুটে মরছে, হাহাকার করে ফিরছে আদিম যুগ-মানসে হয়ত তার এ চিন্তাই উদিত হয় নি। বনী আদম আদিমতার আলোকে নতুন দিগন্তের সন্ধানে সদা ব্যাপৃত।

ইসলাম যেহেতু সহজাত ও স্বাভাবিক ধর্ম সেহেতু মানুষের প্রকৃতিকে সে কোনদিন এড়িয়ে চলেনি বরং একে সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ এক পরিচ্ছন্ন সরল পথের সন্ধান দিয়েছে।

ইসলাম সকলের ন্যায়ভিত্তিক অধিকারের মৌলনীতির এবং এর বুনিয়াদী উৎসের ব্যাপক ইঙ্গিত দিয়েছে, এর জন্য মৌলিক আঙ্গিক রেখা নির্ধারণ করেছে। আর আমরা জানি মৌলিক ন্যায়নীতিগুলি স্বাভাবিক কোন দিন পরিবর্তিত হয় না এই অর্থেই বলা হয় ইসলাম অপরিবর্তনীয়।

ইসলাম অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছে—প্রত্যেকের অধিকার (সুনিশ্চিতভাবে) আদায় করে দাও।[১৮৯] অধিকার আদায়ের বেলায় কোন রকমের শিথিলতা ইসলাম সহ্য করে নি। প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি নিজের অধিকার সংরক্ষিত রাখতে যেয়ে মারা যাবে সে শহীদ হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান, যে ব্যক্তি নিজের অধিকারস্থ সম্পদ সংরক্ষিত রাখতে যেয়ে নিহত হবে সে শহীদ।[১৯০]

ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে এর জন্য সুনির্দিষ্ট মৌল আঙ্গিকধারা নিরূপণ করেছে এবং এর বুনিয়াদী সমাধান পেশ করেছে। যার সাহায্যে আমরা অতি সহজেই একটি

১৮৯. ওয়াতুকুলু জি খাক্কা খাক্কামু।

১৯০. বুখারী।

www.pathagar.com

ন্যায়ানুগ শ্রমনীতি নির্ধারণ করতে পারি। যা আজকের এই সংঘাত-মুখর পৃথিবীকে শ্রেণী-সংগ্রামের অভিশাপ থেকে চিরন্তন মুক্তি দিতে পারে।

এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা হলো, সে শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্মানজনক চুক্তিকে স্বীকার করে। একে সমর্থন জানায়।

আজকাল দেখা যায় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকরা যে চুক্তি করে তা পূরণ করতে যেয়ে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রিতার ছত্রছায়া গ্রহণ করার অপকৌশলে তারা মেতে উঠে—বিরক্তিকর টালবাহানা করতে শুরু করে দেয়। ইসলাম একে অসহ্য রকমের এক জুলুম বলে ঘোষণা করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান, 'সঙ্গতিসম্পন্নদের টালবাহানা করা (মারাত্মক) জুলুম।[১৯১]

আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত দৃপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা করেন—হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলি অবশ্যই পূরণ কর।[১৯২] আর নিশ্চয়ই চুক্তি সম্পর্কে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।'[১৯৩]

আবার অনেক সময় শিল্প-মালিকগণ শ্রমিকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে, তাদেরকে নিকৃষ্টতম ও নিম্নতম শর্তের চুক্তিতে আবদ্ধ করার প্রয়াস পায়। আর বেচারা শ্রমিক যখন নিজের ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত, হাড্ডি-জিরজিরে রোগগ্রস্ত পরিবার-পরিজন ও ছেলে-মেয়েদের অন্ন সংস্থানের এবং নিজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা চিন্তা করে আর ভাবে এ ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই, তখন সে যে কোন শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পিছ পা হয় না। আর মালিকরা তার জিগরের খুন এমনি করেই বিষাক্ত লোলুপতা নিয়ে চেটে চেটে খায়।

কিন্তু ইসলাম বলে—কারো অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে, তার বিপর্যস্ততার ছত্রছায়ায় যে চুক্তি করা হয়, এর শর্তাবলীর কোন মূল্য নেই। এই জুলুমের চুক্তি অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে। একে ইসলাম কোন সময়ই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে সম্মানিত ও অনুমোদিত চুক্তিপত্র বলে স্বীকার করে না।

---

১৯১. বুখারী।

১৯২. ان العهد كان مسئولا ○

১৯৩. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ○

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে বলতে যেয়ে প্রাচ্যের মহান ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) বলেন ঃ

অনন্তর আর্থিক লাভ যদি এইভাবে হাসিল করা হয়, যার মধ্যে চুক্তিকারীদের পারস্পরিক সাহায্য এবং কার্যকরী মেহনতের সম্পর্ক না থাকে যেমন জুয়া বা জবরদস্তিমূলক সম্মতির দখল থাকে যেমন সূদী কারবার, এমন অবস্থায় সর্বহারাদের দল নিজেদের সঙ্গতিহীনতার দরুন (বর্তমান অভাব মেটানোর নিমিত্ত) এমন অনেক শর্তের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে তৈরী হয়ে যায়, যেগুলি আদায় করা তার শক্তির বাইরে। তখন তার ঐ সম্মতি সত্যিকারের সম্মতি হয় না। তাই এবম্বিধ সমস্ত প্রকারের চুক্তি ও লেন-দেন সম্মতিক্রমে অনুমোদিত বলে ধরা যায় না। আর এইগুলির আমদানীর পবিত্র ও ন্যায়ানুগ উপকরণ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ সমস্ত চুক্তি একটি সংস্কৃতিবান দেশের জন্য নিকৃষ্টতম, বীভৎস ও বাতিল চুক্তি।[১৯৪]

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মামুলী ধরনের অধ্যয়নও এর প্রমাণ ব্যক্ত করে যে, ইসলামে উভয় পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতিই কোন বিষয়ের গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি নয়। অন্যের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে দিলেই খুনী তার অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। তেমনি অবস্থার চাপে পড়ে কেউ কোন ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে দিলেও তার উপর জুলুম চালানোর ইখতিয়ার কোন পুঁজিপতির হতে পারে না।

তাই দেখা যায়, যে সকল বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে মূলত অন্যায় এবং যা দিয়ে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের ব্যাপারে বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে, সেখানে পারস্পরিক সম্মতিকেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয় না।

নবী করীম (স.) বলেছেন—মানুষ তাদের চুক্তিবদ্ধ শর্তানুযায়ী দায়িত্বশীল হবে, যদি তা হক ও ন্যায়ানুগ হয়।[১৯৫]

ইসলাম সর্বস্তরে ন্যায়নীতি প্রচলন করতে চায়। ন্যায়কে সে অগ্রে স্থান দেয়। যেখানেই তা আহত হয় সেখানেই সে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইসলামের মূল কথা হলো নবী করীম (স.) বলেন ঃ "নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।[১৯৬]

১৯৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৯৫. মাজমাওজজাওয়ায়ীদ ঃ হায়সামী।

১৯৬. হায়সামী।

www.pathagar.com

দীর্ঘ ভূমিকার পর এখন আমি শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কীয় এবং তাদের সমস্যাবলীর সমাধান কল্পে ইসলামী অর্থনীতির মৌল বিষয়-গুলি নিয়ে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আশা রাখি এতে ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক কার্যক্রম আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

১. মজুরি সমস্যা

আজকের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘাত হলো, মজুরি নির্ধারণ সমস্যা। কি করে মজুরি নির্ধারণ করা হবে, এ সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতি-বিদগণ নানা মত পোষণ করে থাকেন। পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থানুসারে মজুরি নির্ধারণের সর্বাধুনিক সূত্র হলো যেমনভাবে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নির্ধারিত হয়, শ্রমের দামও তেমনি চাহিদা ও যোগানের অনুপাতে নির্ণীত হবে। অর্থাৎ চাহিদা বেশী হলে মজুরি বেশী হবে কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরবরাহ অধিক হলে মজুরি কমে যাবে। তারা বলেন, দ্রব্যের দাম যেমন প্রান্তিক উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি শ্রমিকের মজুরিও তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মজুরি নিরূপণের প্রধান সূত্র হলো—দক্ষতানুসারে কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরি। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই দক্ষতা অনুযায়ী তার থেকে কাজ নেওয়া হবে কিন্তু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে মজুরি দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এখানে সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্যের উপর কথা হচ্ছে। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কার্যধারার উপর নয়। সমাজবাদী দেশগুলির বর্তমান কার্যক্রম সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ হতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজকাল সেখানেও কাজের দক্ষতানু-সারেই মজুরি দেওয়া হয়ে থাকে, শ্রমিকদের প্রয়োজনানুযায়ী নয়।

মননশীলতার সহিত যাচাই করলে দেখা যায়, উপরোক্ত একটি মতও মজুরি নির্ধারণের সুষ্ঠু ও সুসংহত ধারা হতে পারে না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে দ্রব্যবস্তুর মতই প্রাণহীন ও অসহায় করে তুলেছে। দ্রব্য যেভাবে চাহিদা ও যোগানের অধীন, তার কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই তেমনি শ্রমিককেও চাহিদা ও যোগানের অধীন করে ফেলা

www.pathagar.com

হয়েছে। এতে পুঁজিপতিদের খামখেয়ালীর উপর শ্রমিকদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে ক্রেতার মর্জির উপর দ্রব্যের অবস্থা নির্ণীত হয় ঠিক তেমনি এখানে শ্রমের ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজিপতির মর্জির উপর শ্রমিকদের অবস্থা নির্ভর করে।

আমরা জানি আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দরুন দেশের অধিকাংশ অর্থ এবং কর্মবিনিয়োগ স্থল পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পরিণামে মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এতে শ্রমিকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে শ্রমের যোগান বেড়ে যায়। এতে শিল্প-মালিকগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার যথেষ্ট সুযোগ পায় বিশেষ করে অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের জন্য এ এক চরম অভিশাপ। আর এই জন্যই বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ একে এক তরফা সূত্র বলে অভিহিত করেছেন।

এ সর্বজনস্বীকৃত কথা যে, শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা কখনই সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকটি উৎপাদনই কয়েকটি উৎপাদন-উপাদানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়, সম্পূর্ণ দ্রব্য হতে প্রত্যেকটি উপাদানের ব্যক্তিগত অংশ নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

এর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শ্রমিকদের দক্ষতার কোন বিবেচনাই করা হয় নি। এদিকে নজরই দেওয়া হয় নি। মজুরি নির্ধারণের বেলায় শুধু শ্রমিকের প্রয়োজনের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাপারটি কানে মধু বর্ষণ করলেও এদ্বারা কোনদিন কার্যোপযোগী কোন অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হতে পারে না। কারণ শ্রমিক যদি তার দক্ষতার দাম না পায়, এর প্রতিদানে সে যদি কিছুই লাভ করতে না পারে, তবে সে দক্ষতা অর্জনের জন্য কখনই আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে না।

প্রয়োজন কখনও সমান হতে পারে না। এর মধ্যে তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। একজন ইট বহনকারী শ্রমিক যদি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পাঁচশত টাকা মজুরি পায়, আর একজন দক্ষ মিস্ত্রী যদি তার প্রয়োজন অনুসারে দু'শত টাকা মজুরি পায়, তবে কেন সে দক্ষ মিস্ত্রী হতে যাবে? কিসে তাকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

তাই এর ফলে উৎপাদনের কার্যধারার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে যাবে, সুকঠিন আইনের শাসনও একে রোধ করতে পারবে না। এই সূত্রানুযায়ীও মজুরি নির্ধারণ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায় না।

www.pathagar.com

এর সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধান করেছে একমাত্র ইসলাম। ইসলামই একমাত্র এমন এক জীবন-বিধান বা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সকল চরম প্রান্তিকতা হতে মুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতির মজুরি নির্ধারণ সূত্র হলো—ন্যূনতম মজুরি প্রত্যেক শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি দিতে হবে যেন সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে।

পূর্বে ওয়ালীউল্লাহ (রঃ)-এর যে উদ্ধৃতি দিয়েছি এর দ্বারা এই কথা-ই বোঝা যায়। কারণ, আমরা জানি শ্রমিক একান্তভাবে অসহায় না হয়ে পড়লে কোন দিন সে তার প্রয়োজনের চেয়েও কম মজুরি লাভের চুক্তিতে আসতে পারে না। আর যে চুক্তি শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে করা হয় ইসলামের কাছে তার কোন মূল্যই নেই।

আল্লাহ্‌পাকের কালাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীস দ্বারাও আমরা উপরোক্ত সূত্রের সন্ধান পাই। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান—অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে হবে।[১৯৭] তিনি আরও বলেন, এদেরকে (অধীনস্থ-দেরকে) পরিতৃপ্ত করে দেবে।[১৯৮]

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান, যে সমস্ত মাকে সন্তানের পিতা ত্যাগ করেছে তাদেরকে দুধ খাওয়ানোর নিমিত্ত নিয়ে আসলে সন্তানের পিতা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে জীবিকা ও কাপড়-চোপড় দেবে।[১৯৯]

উপরোক্ত আয়াত ও আল হাদীস পর্যালোচনা করলে আমরা নিম্নোক্ত দু'টি সিদ্ধান্তে অনায়াসেই পৌঁছতে পারি। যথা ঃ

ক. মালিক শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে।

অথবা

খ. এমন মজুরি দেবে, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটে যায়।

কারণ ইসলামের মজুরি নির্ধারণ নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এখানে শ্রমিক চাহিদা ও যোগানের, বাজারের সব রকম ওঠানামার অধীন নয়।

---

১৯৭. মুসলিম।

১৯৮. হায়সামী—মাজ্‌মাউজ জাওয়ায়িদ।

১৯৯. বায়হাকী

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন হলো, নিম্নতম মজুরি কি করে নির্ধারণ করা যাবে? এর উত্তরও আমরা সাহাবা-ই-কিরামের কার্যক্রমের মধ্যে পাই।

হযরত উমর (রাঃ) এইভাবে খোরাকী নির্ধারণ করতেন যে, সুস্থ সবল ভাল খেতে পারে এমন কয়েকজনকে ডাকিয়ে এনে খেতে দিতেন এবং তাদের খাওয়ার অনুপাতে তা নির্ধারণ করে দিতেন।[২০০] তিনি তাঁর খিলাফতের আমলে কর্মচারীদেরকে, তাদের প্রয়োজন এবং যে শহরে বাস করবে তার পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী ভাতা দিতেন।[২০১]

আমরাও আজকাল আমাদের পরিবেশ, চাহিদা, জীবন-যাত্রা ইত্যাদির পর্যালোচনা করে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করতে পারি। কারণ মানুষের প্রয়োজন, স্থান, কাল ইত্যাদি অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ ব্যাপারে সমসাময়িক সরকার মধ্যস্থতা করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কাজের দক্ষতারও মূল্য দেয়। অর্থাৎ কাজের দক্ষতা হিসাবে মানুষের উপার্জনের তারতম্য ইসলাম স্বীকার করে। কারণ, এ না হলে কোনদিন কার্যোপযোগী ও সহজাত শ্রমনীতির বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয় না। আর এর দ্বারা ইসলাম সমাজতন্ত্র হতে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পেরেছে।

এদিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন—আমি মানুষের জাগতিক জিন্দিগিতে তাদের জীবিকার উপকরণসমূহ বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের মধ্যে কতকজনকে কতকজনের উপর মর্যাদায় প্রাধান্য দিয়েছি—যাতে একে অন্য থেকে কাজ নিতে পারে।[২০২] কিন্তু এই তারতম্য ও স্তরভেদ থাকা সত্ত্বেও এমন কতিপয় বিধি-নিষেধ দ্বারা একে আবদ্ধ রাখা হয়েছে যাতে উক্ত তারতম্য মাত্র ততটুকুই থাকে যতটুকু একটি সুসংহত ও কার্যকরী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে আবশ্যক, এর বেশী নয়।

এমন অনেক পুঁজিপতিকে দেখতে পাওয়া যায়, যারা শ্রমিকের বিপর্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মজুরি নির্ধারণ না করেই তার কাছ থেকে কাজ নেয় এবং নিজে যা মন চায় তাই মজুরি দিয়ে তাকে বিদায় করে দিতে চায়। শ্রমিক তার আর্থিক দুর্বলতার কারণে এর কিছুই করতে

২০০. ফতুহুল বুলদান।
২০১. ইসলাম কা ইকতিসাদী নিজাম—আল্লামা হিজফুর রহমান।
২০২. বায়হাকী।

www.pathagar.com

পারে না সব কিছু তার নীরবে সহ্য করে নিতে হয়। ইসলাম এই সমস্ত ব্যাপারকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রিওয়ায়েত করেন—রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে মজুর থেকে কাজ নেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। কিন্তু অগ্রিম বা অন্য কোন রকম শর্ত থাকলে সে শর্তানুযায়ী কাজ হবে।

২. কাজের সময় নির্ধারণ

মজুরদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো কাজের সময় নির্ধারণ। পূর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা মজুরদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিত। এমনকি বার হতে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত একজন শ্রমিককে কাজ করতে হত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদিগকেও এ থেকে রেহাই দেওয়া হত না। এই রকমের জুলুমের প্রতিবাদে শ্রমিক সংঘগুলি তৎপর হয়ে ওঠে এবং ১৮৮০ সালের মে মাসে শিকাগোর শ্রমিকগণ আট ঘণ্টা ডিউটি দানের দাবিতে ব্যাপক ধর্মঘট করে, কিন্তু নির্মমভাবে একে দমন করার চেষ্টা করা হয়। অনেক সংগ্রামের পর আট ঘণ্টা দাবি প্রায় সমস্ত দেশই মেনে নেয়।

ইসলাম শ্রমিকদের এই মৌলিক সমস্যাটির অত্যন্ত সুন্দর সমাধান দেয়। আমরা জানি পরিবেশ, জীবনযাত্রার মান, আবহাওয়া ইত্যাদির তারতম্য হেতু মানুষের কর্মক্ষমতাও সমান হয় না। আঞ্চলিক জলবায়ুর প্রভাব মানুষের উপর পড়েই থাকে। একজন বৃটেনের শ্রমিক তার দেশে যতক্ষণ কাজ করতে পারে আমাদের দেশের শ্রমিকও ততক্ষণ পারবে একথা ঠিক হতে পারে না। আবার অনেক সময় কাজের প্রকৃতি হিসেবেও এর মধ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। খনিতে নিয়োজিত শ্রমিক আর একজন 'সেলস্‌ম্যান' একই সময় পর্যন্ত উভয়ই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে তা নয়। আয়াস-সাধ্য ও কঠিন কাজে শ্রমিকগণ স্বভাবত অপেক্ষাকৃত কম সময়েই শ্রান্ত হয়ে পড়ে, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সহজতর

www.pathagar.com

কাজে লিপ্ত একজন শ্রমিক একটানা অনেকক্ষণ কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এইজন্য আট ঘণ্টা বা দশ ঘণ্টা সকল দেশ ও সকল কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

তাই ইসলাম কাজের কোন নির্ধারিত সময় ঠিক করে দেয়নি বরং এর ন্যায়ভিত্তিক মূলনীতি বর্ণনা করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে ততক্ষণেই একজন শ্রমিকের নিকট হতে কাজ নেওয়া যেতে পারে যতক্ষণ সে স্বাভাবিকভাবে তা কুলিয়ে উঠতে পারে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান কাউকে এমন কাজের দায়িত্ব আল্লাহ্ দেন না যা তার সাধ্যাতীত।

আর এই বক্তব্যটিই আরও বিকশিত করতে যেয়ে নবী করীম (স.) ফরমান—যে কাজ তার জন্য অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিও না।[২০৩]

এখন আমরা ঐ মূলনীতির অনুসরণ করে আমাদের দেশের পরিবেশ কার্যক্ষমতা ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজের সময় নির্ধারণ করতে পারি।

৩. কাজের প্রকৃতি

শ্রমিককে দিয়ে কি ধরনের কাজ মালিক নিতে চায় তা-ও পূর্বেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। মজুরের সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে যে কোন কাজে নিয়োগ করার স্বাধীনতা ইসলাম পুঁজিপতিকে দেয় নি। ইসলামের দৃষ্টিতে মজুর পুঁজিপতির হাতের খেলনা নয়, বরং সে তারই সমমর্যাদার অধিকারী স্বাধীন এক সত্তা।

এই সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী আইনগ্রন্থ হিদায়ায় বলা হয়েছে—মালিক কি রকমভাবে উপকৃত হতে চায় তা নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা সহীহ হয় না।

কাজের প্রকৃতি কি ধরনের হতে হবে এ ব্যাপারেও ইসলামের মূলনীতি হলো শ্রমিককে দিয়ে এমন কাজ করানো যাবে না, যা তার জন্য অতি কষ্টকর।

এমনিভাবে কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কোন কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

---

২০৩. বুখারী।

www.pathagar.com

৪. স্থানান্তর গমনের অধিকার

অধিকতর সুবিধাজনক স্থানে চলে যাওয়ার অধিকার মানুষের অন্যতম জন্মগত অধিকার। এতে হস্তক্ষেপ করা মানেই একজন মানুষের স্বাধীন সত্তায় হস্তক্ষেপ করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একে স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এমন অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে যার কারণে শ্রমিকগণ এ থেকে পুরোপুরিভাবে লাভবান হতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে পিষে মারা হচ্ছে যে, শ্রমিককে তার এই মানবিক স্বাধীনতাটুকু হতেও আজ বঞ্চিত রাখা হয়েছে। সেখানে নিজের ইচ্ছামত একজন শ্রমিক কাজ বাছাই করে নিতে পারে না বা স্থানান্তর গমন করতে পারে না। সেখানে একজন শ্রমিক কতকজন কমরেডের খেয়াল খুশীর অধীন। স্টালিনের আমলে এ এক অসহনীয় রূপ ধারণ করেছিল। ১৯৪০ সনের ২৬শে জুনের এক সরকারী নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল—মাসিক অথবা রোজ ভিত্তিক যে কোন মজুরই হোক না কেন, তাকে স্বাধীনভাবে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করা হতে নিষেধ করা হল। এ অধিকার শুধু কারখানা ডাইরেক্টরেরই আছে। এই আদেশ অমান্য করলে দুই থেকে চার মাস জেলের ভোগান্তি সহ্য করতে হবে।

ইসলাম মজুরের এই স্বাভাবিক ও স্বাধীন অধিকারকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিয়েছে এবং এর নিশ্চয়তা বিধান করেছে। এ সংশ্রবেই রসূলে পাক্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান—সমস্ত দেশ ও যমীন আল্লাহ্‌র, আর সমস্ত মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা। তাই যেখানেই তুমি মঙ্গলজনক মনে কর সেখানেই বাস কর।[২০৪]

উপরোক্ত হাদীসটি পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত তিনটি ধারা আমরা পেতে পারি। যথাঃ

ক. সমস্ত দেশ আল্লাহ্‌র। তাই আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ স্থানান্ত গমন হতে বিরত রাখতে পারে না।

খ. সমস্ত বান্দা আল্লাহ্‌র। তাই আল্লাহ্‌র বিধান ব্যতীত কারো উপর অন্যায় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে না।

গ. যেখানে সুবিধা হয় সেখানেই থাকা যাবে।

---

২০৪. মাজ্‌মাউজ্ জাওয়ায়ীদ ঃ হায়সামী।

www.pathagar.com

৫. লাভের অংশীদার

আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিই সমস্ত লাভের অংশ হাতিয়ে নেয়। বোনাসের নামে শ্রমিককে যৎসামান্যই দেওয়া হয়। আর এমনি করেই অতিরিক্ত সম্পদ দ্বারা পুঁজিপতিদের পকেট ফুলে ফেঁপে ওঠে। রক্ত পানি করে মেহনত করার পর একজন শ্রমিক দেখে সমস্ত কিছুই পুঁজিপতির হাতে চলে গিয়েছে। সে হয়েছে রিক্ত, আর রিক্তের নেই মাথাগুজবার ঠাঁইটুকুও।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিকদের লাভের মধ্যে অংশীদার হওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এর নিমিত্ত ইসলাম মুজারাবাত, মুসাকাত, মুজারা-আত প্রভৃতি পন্থা নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদেরকে মুনাফার অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমান—শ্রমিকদেরকে তাদের শ্রমার্জিত সম্পদ (লাভ) হতেও অংশ দিও। কারণ আল্লাহ্‌র মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না।[২০৫]

৬. স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য হল আল্লাহ্‌র পবিত্র এক আমানত। তাই স্বাস্থ্যহানিকর কিছু করা অপরাধ।

ইসলাম মজুরদের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদ দিয়েছে। ইসলাম বলে শ্রমিক-দের জন্য এমন স্থান নির্মাণ করতে হবে, তাকে এমন পরিবেশে রাখতে হবে যা সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের উপযোগী। এই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ ইবনে হাযম (রাঃ) বলেন—মালিকের জন্য উচিত শ্রমিকের কাছ থেকে এতটুকু কাজ নেওয়া, যতটুকু সে অনায়াসে সুষ্ঠুভাবে করতে পারে—তার সামর্থ্যে কুলায়। এমন কিছু তার দ্বারা করাতে পারবে না, যার ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, তার লোকসান হয়।[২০৬]

তাই তাকে এমন পরিবেশে রাখা যাবে না, যাতে তার স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

নবী করীম (স.) নিজে ভৃত্য কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন।

---

২০৫. আহমদ হায়সামী।

২০৬. মুহাল্লা—লি ইবনে হাযম।

www.pathagar.com

হযরত উমর (রাঃ)-ও অসুস্থ কর্মচারীদের সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হচ্ছে কি-না এর খোঁজ-খবর নিতেন। কেউ এই কর্তব্যে অবহেলা করলে তাকে পদচ্যুত করতেন।

৭. শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ দান

আজকাল শ্রমিকদের জন্য এ এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যের দরুন নিজেরাও শিক্ষিত হতে পারে না। আর ছেলে-মেয়েদিগকেও শিক্ষিত করে গড়ে তোলার সুযোগ পায় না। ফলে শিক্ষিতের হার আমাদের দেশে অত্যন্ত কম এবং শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব অত্যন্ত প্রকট। এতে জাতীয় উৎপাদনে যে কতটা ঘাটতির সৃষ্টি হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইসলাম উক্ত সমস্যারও একটা ন্যায়ভিত্তিক সমাধান দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা মূলত রাষ্ট্রের কর্তব্য, হুকুমতের উপরই তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা সাধারণভাবে অবৈতনিক এবং রাষ্ট্রই সকল ব্যয়ভার বহন করবে। হযরত ওজীল ইবনে আতা (রাঃ) বর্ণনা করেন—মদীনায় তিনজন ছিলেন, যারা শিশুদেরকে শিক্ষা দিতেন। আর হযরত উমর (রাঃ) তাঁদেরকে (ব্যয়তুলমাল হতে) মাসোহারা দিতেন।[২০৭]

৮. বাসস্থান

পূর্বে শ্রমিকদের এই সমস্যা আজকালকার মত এত প্রকট হয়ে দেখা দেয় নি। এমন করে শিল্প কারখানারও সম্প্রসারণ ঘটে নি। নিজের বাড়ীতে থেকেই মেহনতিজনেরা নিজেদের মেহনত বিনিয়োগ করার অফুরন্ত সুযোগ পেত। আহার্য সংগ্রহে তাদের বাড়ী ছেড়ে বেরুনোর বিশেষ প্রয়োজন হত না। কিন্তু আজকাল অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে।

ইসলাম এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য সমসাময়িক ইসলামী সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে, ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে এর সমাধান করার-যেন কারও উপর জুলুম না হয়। হযরত উমর (রাঃ) সরকারী কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিতে যেয়ে বলতেন "সবচেয়ে ভাল এবং নেকবখত্ শাসনকর্তা

---

২০৭. কানযুল উম্মাল।

www.pathagar.com

সে-ই যার অধীনে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার সাথে থাকে। আর সবচেয়ে বদবখত শাসনকর্তা সে-ই, যার প্রজা-সাধারণ অভাব ও অশান্তিতে দিন যাপন করে।[২০৮]

৯. ক্ষতির দায়িত্ব

অনেক সময় দেখা যায় যে, আত্ম-সর্বস্ব, অর্থ-গৃধ্নু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদেরকে অনর্থক হয়রানী করতে আরম্ভ করে দেয়। আত্ম-স্বার্থ পূরণের এক জঘন্য লালসায় মেহনতীদের বিরুদ্ধে কাজ খারাপের অভিযোগ এনে ক্ষতিপূরণের নামে শোষণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

ইসলাম এখানেও এক ন্যায়ভিত্তিক সমতার ফয়সালা করে। ইমাম ইবনে হাযম লিখেন, যাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রমিক হিসাবে রাখা হয়েছে, তার হাতে যদি ক্ষতি বা কোন কিছু নষ্ট হয়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব শ্রমিকের উপর বর্তায় না। হাঁ, সে যদি ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে তা করে তবে অন্য কথা। আর এই ব্যাপারে কোন স্বাক্ষী না থাকলে মজুরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে কসম সহ'।[২০৯]

আজকাল দেখা যায়, পুঁজিপতিরা কৌশলে কৃত্রিম ঘাটতির সৃষ্টি করে এবং মজুরদের মজুরি কমিয়ে দেওয়ার এক অপপ্রয়াস পায়। এতে মজুরদের অবস্থা কতটুকু অবর্ণনীয় হয়ে ওঠে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে সমস্ত শ্রমিককে নিয়োগ করা হয়, উৎপাদনের ঘাটতির জন্য তার সম্মতি ব্যতিরেকে পারিশ্রমিকে কোন প্রকার কমতি করা যাবে না। ঘাটতির লোকসান পুঁজিপতিকেই বহন করতে হবে। এ ঝুঁকি অসহায় মজদুর কোন প্রকারেই নিতে পারে না।

১০. চাকুরীর নিরাপত্তা

এই ব্যাপারেও ইসলাম দৃষ্টি দিয়েছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিষয় যেহেতু প্রশাসক বিভাগের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই সমসাময়িক ইসলামী প্রশাসকদেরকে ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

২০৮. সীরাতে উমর ইবনে খাত্তাব।
২০৯. মবসূত।

www.pathagar.com

অনেক সময় নানাবিধ কারণে শ্রমিকদের চাকুরী ছেড়ে দিতে হয়, ইসলাম মজুরকে এর স্বাধীনতা দিয়েছে। আল্লামা সারাখসী (র ঃ) বলেন—'শ্রম' সম্পর্কীয় চুক্তি বিশেষ ও সুবিধার জন্য বাতিল করা যায়। কারণ শ্রমের বিনিময় মেহনতীদের সুবিধা বিধানের নিমিত্তই প্রচলিত রাখা হয়েছে। তাই যখন মেহনতী জনতা করতে না চায় বা তার পূর্ব মত পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে এর উপর বাধ্য করা তার জন্য কষ্টেরই কারণ হবে।[২১০]

এমনিভাবে নিয়োগকারীর মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিলে, সে শ্রমিকের সঙ্গে কৃত চুক্তি বাতিল করতে পারে।

কিন্তু এ সকল ব্যাপারে ইসলামী সরকারের কর্তব্য হলো সব কিছু ন্যায়নীতির ভিত্তিতে হচ্ছে কিনা এদিকে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা যেন কোন রকমের বিপর্যয়ের সৃষ্টি না ঘটে।

শ্রমিকের যদি চাকুরী চলে যায় তখন তার ও চাকুরীর ব্যবস্থাকরণ এবং যত দিন কোন সুবিধা না হয়েছে ততদিন তার ও তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে আসছে।

১১. দাবি-দাওয়া পেশের অধিকার

ইসলাম মূলত এমনই এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়. যেখানে সবারই অধিকার সংরক্ষিত থাকে এবং চাইবার আগেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দিতে সকলই উদ্বুদ্ধ থাকে—কোন দাবি পেশের দরকারও যেন না পড়ে।

এর পরও যদি কারও অধিকার আদায় না হয় তবে তাকে দাবি পেশ করারও অধিকার দিয়েছে। নবী করীম (স.) বলেন—'যাচ্ঞা করা একটি পেষণ যন্ত্র যা দ্বারা মানুষ তার নিজের চেহারাই পিষে ফেলে। কিন্তু কোন মানুষ যদি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে বা যা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না এমন জিনিসের দাবি নিয়ে আসে তবে সেটা তার যাচ্ঞা হবে না।

---

২১০. তিরমিযী।

www.pathagar.com

অর্থাৎ এ অধিকার আদায়ের দাবি—এ' প্রার্থনা নয় বা কারও কাছে অনুকম্পা সন্ধান করা নয় বরং এ' তার বাঁচার অধিকার।

১২. বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

আজকাল এ এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রমিকের একমাত্র পুঁজিই হলো শ্রম। কিন্তু শ্রমিক বৃদ্ধ বা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর পুঁজি বলতে কিছুই থাকে না, যা খাটিয়ে সে অন্ন-সংস্থানের উপায় করবে। তখন একান্তভাবে অসহায় হয়ে পড়ে সে। যার জন্য সে তার যৌবনের উষ্ণ রক্ত ও সামর্থ্য ব্যয় করে আজ সে নিঃস্ব ও রিক্ত সেই পুঁজিপতি তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

বিরাট সংসারের বোঝা কিন্তু আয়ের উপায় বলতে নেই কিছুই। এই অবস্থায় একজন মানুষ কতটা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে—কতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধনবাদী অর্থ ব্যবস্থায় 'প্রভিডেন্ট ফান্ড' ইত্যাদির নামে যা কিছু দেওয়া হয়ে থাকে তা এত অপ্রতুল যে, হাস্যকর ঠেকে। তা-ও আবার তার পারিশ্রমিক হতে কেটে নিয়ে দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অবস্থা আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে। কারণ সেখানে শ্রমই একমাত্র উৎপাদন উপাদান। এ না থাকলে কেউ উৎপাদিত পণ্যে অংশই পেতে পারে না। তাই সেখানকার শ্রমিকরা অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়লেও অবসর গ্রহণের নামে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা অত্যন্ত কম পেনশন পায়।[২১১]

এর এক বাস্তব সমাধান দেয় ইসলাম। ইসলামের দৃষ্টিতে বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, নিঃসহায়, ইয়াতিম, বিধবা এবং দুর্বলজনদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার ইসলামী সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য। সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় কোষাগার হতে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করবে এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করবে এ হলো সাধারণের নাগরিক অধিকার।

---

২১১. ব্যাসিলে—সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক দেশ।

www.pathagar.com

নবী করীম (স.) যখন মদীনায় আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন তখন এর চরম নিদর্শন দেখিয়ে গিয়েছেন।

নবী করীম (স.) বলেন-যে সব ব্যক্তি অসহায় পরিজন রেখে গেছে, তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার অর্থাৎ সরকারের উপর।[২১২]

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর খিলাফত আমলে এই ব্যাপারে কে কতটুকু মর্যাদার অধিকারী সেদিকেও চাইতেন না; বরং সমভাবে অর্থ-বণ্টন করে দিতেন। একবার তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, বলেছিলেন—কে কতটুকু ইসলামের খিদমত করেছেন তা আমার জানা আছে। এর বিনিময় আল্লাহ্ পাক দেবেন। কিন্তু এ (জাতীয় কোষাগারের সম্পদ) জাগতিক জীবন-নির্বাহের উপায় মাত্র। তাই এখানে কাউকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতার ভিত্তিতে বণ্টন করে দেওয়াই অধিকতর শ্রেয়।[২১৩]

হযরত উসমান (রাঃ) খিয়ারে জেহেন্দীর (রাঃ) বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও সন্তানের আধিক্য দেখে তাঁর জন্য এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য বায়তুল-মাল থেকে পৃথক পৃথক ভাতার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন [২১৪]

এমন কি এর মধ্যে মুসলিম-অমুসলিমের কোন তারতম্য করা হয় নি। ইসলামের দৃষ্টিতে এ সকল নাগরিকের সমান অধিকার। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রখ্যাত সালারে আজম খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)-কে মুসলিম ও অমুসলিম সকল বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক সমতার কথা উল্লেখ করে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন ঃ

আমি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যিম্মীদের মধ্যে (ইসলামী রাজ্যে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা) যারা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে, বালা-মুসিবতের দরুন বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা কোন ধনী দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং তার সমধর্মিগণ তাকে খয়রাত করতে শুরু করে—এই সমস্ত লোকদের জিযিয়া মওকুফ করে দেওয়া হবে। আর যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন সরকার তার এবং তার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে নেবে।[২১৫]

---

২১২. মিশকাত।
২১৩. ইসলামী মুআ'শিয়াত—আল্লামা গিলানী।
২১৪. কিতাবুল আমওয়াল।
২১৫. কিতাবুল খারায—লি ইমাম আবি ইউসুফ (রাঃ)।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের কথা লিখতে গিয়ে 'মুখতারুল কাউনাইনে' বলা হয়েছে—ভাল করে জেনে রাখা উচিত মানুষের প্রয়োজনীয় উপকরণে তিনটি জিনিস অত্যাবশ্যক, পুরুষ মেয়ে সবাই এতে সমান। কারণ জীবন ধারণ করে থাকা, আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী ইতমিনানের সঙ্গে করা এবং বংশরক্ষা করা ঐ তিনটি জিনিসের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। তাই খলীফার জন্য উচিত, প্রত্যেকটি মানুষ পুরুষ-মেয়ে নির্বিশেষে তাদের অবস্থা এবং প্রয়োজনকে সামনে রেখে, এই জিনিসগুলি লাভে সর্বপ্রকার সহজতর সুবিধার বন্দোবস্ত করে দেওয়া। এই তিনটি জিনিস হলো ঃ

ক. খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাকরণ।

খ. পোশাক-পরিচ্ছদের বন্দোবস্তকরণ।

গ. পারিবারিক ও বৈবাহিক জিন্দিগীর সুবিধা প্রদান—কেননা বংশরক্ষার জন্য এ অতীব প্রয়োজনীয়।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লামা সৈয়দ আলীজাদা হানাফী (রাঃ) বলেন—খলীফা তার রাজ্যে কোন ফকিরকে ফকির, কোন ঋণগ্রস্তকে ঋণগ্রস্ত, কান দুর্বলকে অসহায়, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রহীন এবং কোন অত্যাচারিত মজলুমকে এর প্রতিকার হতে বঞ্চিত করে রাখতে পারে[২১৬]

শ্রমিক ও মালিকের অধিকার বিষয়ক প্রশ্নটি শুধু মুফতির ফতওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং এ অনেকটা ইসলামী কাযী বা বিচারকের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পর্কীয় আলোচনার সঙ্গে সাধারণত সম্পর্ক রাখে। তাই এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে ফিক্‌হর ঐ সমস্ত পরিচ্ছেদের অধ্যয়নও অত্যন্ত জরুরী যে সমস্ত পরিচ্ছেদে বিচারকদের তা ও ইখতিরকে আলোচনা করা হয়েছে।

২১৬. শরহে শরাতে ইসলাম।

www.pathagar.com

শ্রমিকদের অধিকার আদায় ও সংরক্ষণে সরকারী দায়িত্ব

পূর্বে অনেক বারই বলে এসেছি, ইসলাম মূলত এমন এক সমাজ-কায়েম করতে চায় যেখানে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্তব্য আদায় করে এবং একে অপরের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এর জন্য ইসলাম ঈমান ও আমলে সালেহী দ্বারা এক পরিবেশ গঠন করে। যেখানে সৎপথে চলা সকলের জন্যই অত্যন্ত সহজতর হয়ে ওঠে। এ শুধু কতকগুলি কাল্পনিক আদর্শগত কথা নয় বরং ইসলাম খুলাফায়ে রাশেদার আমলে এর বাস্তব রূপ কায়েম করে জগতবাসীকে তার লাভা-লাভ প্রত্যক্ষ করে দেখিয়ে নিয়েছে। ইসলামের অভিপ্সিত পরিবেশ কায়েম করতে সচেষ্ট হলে আজকের পৃথিবীও এর বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারত।

এমন এক পরিবেশে বাস করার পরও যদি এমন কেউ থেকে যায় যার মধ্যে শয়তানিয়্যত ও শোষণের মনোবৃত্তি মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। তখন একে সংশোধন করার জন্য তাকে সৎপথে চালিত করার জন্য ইসলাম একটা ন্যায়ানুগ প্রশাসন ব্যবস্থারও বন্দোবস্ত রেখেছে।

আমরা জানি যেমনিভাবে নৈতিক আবেদন ব্যতীত শুধু প্রশাসন ব্যবস্থা দ্বারা কোন বিধান চলতে পারে না, তেমনিভাবে অনেক সময় নৈতিক নির্দেশাবলীই যথেষ্ট হয় না; বরং আইনের শাসনও কায়েম করতে হয়।

তাই ইসলাম শ্রমিকদের অধিকারকে শুধু মালিকদের নৈতিকতার উপর ছেড়ে দেয় নি। বরং এ' সুষ্ঠুভাবে আদায় হচ্ছে কি না, সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা এদিকেও নজর রাখা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজে অনেক সময় ঐ সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অন্যকেও নির্দেশ দিয়েছেন। একদিন আবু মাসউদ (রাঃ) তাঁর চাকরকে মারছিলেন, তখন পিছন হতে একটি আওয়াজ শ্রুত হলো—আবু মাসউদ, খবরদার। আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন—রাগে আমার এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, কে

www.pathagar.com

আওয়াজ করল তা বুঝতে পারি নি। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলছেন—আবু মাসউদ, খবরদার। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার চেয়েও বেশী শক্তি রাখেন। তখন তিনি অনুতপ্ত হয়ে বললেন—এ'কে আমি আযাদ করে দিলাম।

নবী করীম (স.) বললেন—যদি তা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিত।[২১৭]

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) প্রায়ই মদীনার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে লোকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন এবং কোথাও কোন মজুর ও গোলামকে নির্যাতিত হতে দেখলে বা প্রাণান্তকর শ্রমে নিয়োজিত দেখলে এর প্রতিকার করতেন।

ইসলাম শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করার অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রকে দেয়। মজুরি বা অন্যান্য কোন বিষয়ে মত-বিরোধ দেখা দিলে রাষ্ট্রকে ন্যায়ানুগ কর্মপন্থা নির্ধারণ করার অধিকার দেয়। হযরত উমর (রাঃ) সময় সময় তাঁর খিলাফত আমলে, নিজেই মজুরি নির্ধারণ করে দিতেন।

একজন সৎকর্মশীল ইসলামী প্রশাসক কতটুকু দায়িত্বশীল হয় তা আমরা খলাফায়ে রাশেদার সামগ্রিক কার্যক্রম দ্বারা কিছুটা অনুমান করতে পারি। হযরত উমর (রাঃ) কেমন করে রাতের পর রাত প্রজা সাধারণের অবস্থা জানার জন্য ঘুরে বেড়াতেন তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এত করার পরও তিনি বলতেন—যদি আমি জীবিত থাকি তবে ইনশা আল্লাহ্, রাত্রিকালীন সমস্ত দেশ এবং এলাকা জুড়ে বিচরণ করব কারণ, আমি জানি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও অনেকেরই অনেক প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না—তারা আমার কাছেও আসতে পারে না; আর কর্মচারীরাও হয়ত তাদের সকলের সংবাদ আমার কাছে পেঁছায় না। তাই আমি দুমাস মিসর, দুমাস বসরা এমনিভাবে কূফা ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাও ঘুরে ঘুরে দেখব।[২১৮]

উমাইয়া খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) সারা রাত্র জায়নামাযে পড়ে পড়ে কাঁদতেন। তাঁর বেগম এত বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন—আমার অবস্থা এই

২১৭. মুসলিম।
২১৮. তারিখে তবরী।

www.pathagar.com

যে সাদা কাল সমস্ত উম্মতে মুসলিমার অভিভাবক আমি, আমি ভাবি—অনেক দূর এলাকায় অনেক অসহায় মুসাফির অনেক দুর্গত অবস্থার জন্য হয়ত ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে, অনেক অভাবগ্রস্ত গরীবজন, মজুর, কয়েদী এবং অনেক নিঃস্বও আছেন। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্ পাক তাদের কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আর হুযুরে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই তাদের পক্ষ হয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন: আমার ভয় হয় ঐ দিন আমি কোন জবাবদিহি করতে পারব না এই চিন্তায়ই আমি বিষণ্ণ, আমি কাঁদি।[২১৯]

এই ছিল ইসলামী শ্রমনীতির কতিপয় উজ্জ্বল রূপরেখা—যা সকল প্রকার প্রান্তিকতা হতে মুক্ত। ভরসা রাখি, এ দ্বারা ইসলামের শ্রমনীতি, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নীতি হতে কতটুকু স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী এবং এর বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গীই বা কি তা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে আল্লামা আবুল কালাম আযাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—ইসলাম যে সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধান দেয়, তা শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রেই নয়; বরং সার্বিকভাবে এর প্রত্যেকটি ধারা যদি আপন আপন স্থানে ঠিক ঠিক ভাবে কায়েম হয়ে যায়, তবে এমন এক সামাজিক পদ্ধতির উদ্ভব হবে, যাতে একদিকে সৃষ্টি হবে না অসংখ্য ধন কুবেরের। অন্যদিকে সৃষ্টি হবে না লাঞ্ছিত, অসহায় ভুখানাঙ্গা শ্রেণীর। তখন এমন একটি অভাবনীয় রকমের সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যম অবস্থার জন্ম হবে যার প্রাচুর্য অধিকাংশ জনই ভোগ করবে।

তাই আজকের এই সংঘাত বিক্ষুব্ধ পৃথিবীকে সকল প্রকার ইসলামী ন্যায়নীতি গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ রাস্তায় চলার আহবান জানাই—দুনিয়া পরীক্ষা করে দেখেছে, এছাড়া কোন দূসরা পথ তার নেই।

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ وَظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

২১৯. কিতাবুল খারায।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

আ

আইয়ুব সিখতিয়ানী ৬২
আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) ৪২
আতা (রাঃ) ৫৯
আদম (আঃ) ৪৭
আনাস (রাঃ) ৫৯, ৬৫, ৬৬
আবুল আলিয়া ৬৮
আবুল কালাম আযাদ ১২৫
আবু ইয়াসর (রাঃ) ৬৮, ১০১
আবু ইউসুফ ৭৮, ৮৩
আবু উবায়দা (রাঃ) ৫৩, ৫৬
আবু বকর (রাঃ) ৪১, ৪৮, ৫৩, ৫৪, ৭৪, ১২১
আবু মাসউদ (রাঃ) ৫১, ১২৩, ১২৪
আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) ৫১
আবু যর (রাঃ) ৫৪, ৬৭, ৬৮, ১০৫
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ১১৩
আবু হানীফা (রঃ) ৭৮, ৮৫
আবু হুরায়রা (রাঃ) ৪২, ৪৯, ৫০, ৯৭
আবু হুযায়ফা ৫৫, ৫৬, ৬৮
আবদুর রহমান জুয়াইরী ৮৫
আবদুল মালিক ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১
আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) ৬১
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ৯৮, ৯৯
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ৬১
আবদুল্লাহ ইবনে জুদাআন ৫৬
আমেরিকা ২, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ২১
আম্বিয়া-ই-কিরাম ৩৫, ৪৭
আম্মার (রাঃ) ৫১, ৫৫, ৫৬
আলী (রাঃ) ৪২, ৪৩, ৪৮, ৫৬, ৮৪, ১০০
আলতাফ হোসেন ২০
আসমা (রাঃ) ৪৩
আয়েশা (রাঃ) ৫০, ৫২

ই

ইউনিট ২২
ইউরোপ ১, ৬, ১০, ১৫
ইউসুফ (আঃ) ৭১
ইকরামা (রাঃ) ৫৮, ৬২
ইটালি ৮, ২৬
ইজারা ৮৮, ৯৯
ইজভেস্তিয়া ২৭
ইদ্রিস (আঃ) ৪৭
ইবনে আবি লায়লা ৭৮
ইবনে আবি রাবাহ্ ৫৯
ইবনে আবি বকর (রাঃ) ৫৩

www.pathagar.com

ইবনে উমর (রাঃ) ৫৩, ৭৭, ৮৩
ইবনে মাসউদ (রাঃ) ৩৯, ৫০, ৫১, ৮৪
ইবনে মুবারক ৫৮
ইবনে আব্বাস (রাঃ) ৬২
ইবনে শিরীন ৮৪
ইবনে শিহাব জুহ্‌রী ৫৯, ৬১
ইবনে হাজর আসকালানী ১০০
ইবনে হাযম (রাঃ) ১১৬, ১১৮
ইবরাহীম নখয়ী (রাঃ) ৬০
ইরিক্‌সিল ৪
ইসমাইল ইবনে উবায়দিল্লাহ ৫৮
ইহইয়া-ই-মাওয়াত ৮৮
ইয়ান্‌ ২২
ইয়ামন ৫৯
ইয়াযীদ ইবনে হাবিব ৬০

উ

উকাবা-ইবনে-আবি মুআইত ৫০
উবাদা ইবনে অলীদ ৬৮
উমর (রাঃ) ৪১, ৪৩, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৬৯, ৭৮, ৮৪, ৯২, ১১২, ১১৭, ১২৪
উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ৮৪, ১২৪
উরওয়া (রাঃ) ৮৪
উসামা (রাঃ) ৫১, ৫২, ৫৩
উসমান (রাঃ) ১২১

এ

এক্সনভ ২৫
এনায়াহ ৭৮
এম. ওয়াই ইউয়ন ১৯

ও

ওজীল ইবনে আতা (রাঃ) ১১৭

ক

কমুনিজম ১৮, ২৮, ৩৩
কাওস ৪৫
কাবা ৫৩
কাসিম ৮৪
কিউবা ১৫
কুটীরশিল্প ১, ২, ৯৩
কূফা ৬০, ১২৪
কেরায়াতুল আরজ ৮৭
ক্যাম্পবেল ২৯
কোসিগিন ১৭, ২৩
ক্রুশ্চেভ ১৯, ২৮
ক্রুসেড ১

খ

খাদীজা (রাঃ) ৪৬, ৮০
খাব্বাব (রাঃ) ৫১
খালিদ (রাঃ) ৫৫, ১২১
খিয়ারে জেহেন্দী (রাঃ) ১২১
খুরাসান ৬০

গ

গিলানী (রঃ) ৯৮

চ

চার্লস ফুরিয়ে ১২

www.pathagar.com

চেকোশ্লাভাকিয়া ১৫, ৩২
চীন ১৫, ২১, ২২, ৩২, ৩৩

জ

জাপান ১১
জাহ্হাক ইবনে মুজাহিম ৬০
জার ১৩, ১৪, ৩২
জয়নুল আবেদীন ৫৭, ৫৮
জোবেদা ৬১
জোসেফ প্রুধো ১২
জজীরা ৬০

ট

টাউন্সেন্ড ৭
ট্রেড ইউনিয়ন ২৩, ২৬

ড

ডেনমার্ক ৮

ত

তাস ১৮
তালুত ৭১
তাউস ইবনে কায়সান ৫৯

দ

দাউদ (আঃ) ৩৮, ৪৭

ন

নাফে ৫৮
নিউলানার্ক ৮, ১২
নিকোলাস ১৫
নূহ (আঃ) ৪৭

প

পাকিস্তান ১১
পিকিং ৩২
পোপবাদ ১
পোলান্ড ১৫, ৩২
প্রোগ্রামের সমালোচনা ১৮

ফ

ফজল ইবনে আববাস ৫২
ফাতিমা (রাঃ) ৪৩, ৪৮
ফুকাহা-ই-উম্নত ৭২
ফ্রান্স ৮, ১০, ১১
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস ১২, ৩৪, ১০৩

ব

বদর ৪৮
বনি ইসরাঈল ৭১
বনি উমাইয়া ৫৬
বনু মখজুম ৬১
বলশেভিক ১৫, ২৭
বসরা ৬০, ১২৪
বাংলাদেশ ১১
বাদায়ে ওয়া সানায়ে ৮৩
বামপন্থী ১৭, ৩০
বার্লিন ৩২
বিলাল (রাঃ) ৫১, ৫৩, ৫৪, ৬৫
ব্যাবিলন ২৫
বুখারী ৮৪
বুছরা-বিনতে গাজওয়ান ৪৯
বুর্জোয়া ১, ২, ৫, ৯
ব্রজকিশোর শাস্ত্রী ২২, ২৫

www.pathagar.com

ব্রাজিল ৫
বৃটেন ৮, ৯, ১০, ১১, ১১৩

ভ

ভারত ১১, ২২
ভাইসিনস্কী ৩০
ভিক্টর ক্রবিচেসকো ৩০, ১৩
ভূমিহীন ২, ৩

ম

মক্কা ৫২, ৫৩, ৫৯
মকহুল ৫৮, ৬০
মদীনা ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৬৮, ৮৪, ৯১, ১১৭, ১২৪
মর্নিং স্টার ২৩
মস্কো ২৭, ২৮
মাও ২৫, ৩২, ৩৩
মার্কস ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২৪, ৩৪, ৩৫
মার্কিন দূতাবাস ৭
মালে ফাই ৪১
ম্যানডেভিল ৭
ম্যাক্স স্টিরনার ৯৪
ম্যানচেস্টার ১২
মিখাইল বাকুনীন ১২
মিঃ এস. ভস্কী ১৯
মিলাভন জেলাম ২০, ২৪, ২৫, ২৮
মিসর ৫৯, ১২৪
মুখতারুল কাউনাইন ১২২
মুজারাআত ৮৩, ৮৬, ৮৭, ১১৬
মুজারাবাত ৪৬, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৫, ১১৬
মুজাহিদ ৫৮, ৬১
মুফতি শফী ১০৩
মুসাকাত ৮৬, ১১৬
মুসা (আঃ) ৪৭, ৬৪
মোবারক সাগ ২০

য

যয়নব (রাঃ) ৫২, ৫৭
যয়লয়ী (রাঃ) ৭৭
যায়দ (রাঃ) ৫১, ৫২, ৫৭, ৬৫
যুগোশ্লাভিয়া ২৭
যুবায়র (রাঃ) ৪৩

র

রবার্ট ওয়েন ৮, ১২
রম্টো ১৭
রাফে (রাঃ) ৮৭
রাশিয়া ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২১, ২৬, ২৯, ৩২
রিক্কা ৬১
রুবল ১৯, ২০, ২১
রুমানিয়া ১৫

ল

লিভারপুল ৫
লিয়নস ৬, ১০
লুইকিসা ২১
লুইব্রাঙ্ক ১২
লেনিন ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ৩১, ৩৩, ৩৫
লেবার পার্টি ১০

www.pathagar.com

শ

শরাহ শবআতে ইসলাম ১০২
শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রঃ) ৭৬, ৮০, ১০৮, ১১৮
শিকাগো ১১৩
শিরকতে উজুহ্ ৮৭
শিরকতে সানাএ ৮৭
শিল্প বিপ্লব ১, ৬
শিল্পাশ্রম ১
শোআইব (আঃ) ৪৭, ৬৪

স

সমাজতন্ত্র ১২, ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২৩, ৩৩, ৩৫, ৭৬, ১০৯, ১১২
সাজারা-এ-এরাক ৪৭
সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ৪১, ৮৪
সাফওয়ান (রাঃ) ৬৯
সারাখসী ৮৩, ১১৯
সালেম (রাঃ) ৫৬, ৫৮
সাহাবা-ই-কিরাম ৪১, ৪৭, ৫৬, ৫৮, ৬৭, ৬৮, ৮১, ৮৪, ৯৮, ১০১, ১০২
সিরিয়া ৫৩, ৬০
সুআইদিয়াৎ ৮১
সুফিয়া (রাঃ) ৫৭
সুমাইয়া ৫৫
সুহাইব (রাঃ) ৫৬
সুয়াইব (রাঃ) ৫১
সেণ্ট সাইমন ১২
সৈয়দ আলীজাদা হানাফী (রাঃ) ১২২
সোভিয়েত ১৫, ১৮, ২৭, ২৮, ৩০
স্টালিন ১৭. ২১, ২৩, ২৪, ১১৫

হ

হাকীম-ইবনে-হাযম (রাঃ) ৪১, ৪২
হাঙ্গেরী ৩২
হানযালা ইবনে কায়েস ৮৭
হারুন-অর-রশীদ ৬১
হাসান (রাঃ) ৫২
হাসান ইবনে আবিল হাসান ৬০
হাসান বসরী ৫৮
হিদায়া ১১৪
হিফজুর রহমান ৮২

য়

য়াহুদী ৩৩, ৪২, ৪৮, ৫৭, ৮৩

IFB-86-87-P/3322-5250---30.9.1986

www.pathagar.com

www.pathagar.com